হিন্দুধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্কসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আরও হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশই হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. অসীম সরকার

অধ্যাপক ড. বিপুল কুমার বিশ্বাস

সুবর্ণা সরকার

জয়দীপ দে

বহ্নি বেপারী

সুমন চক্রবর্ত্তী

ড. প্রবীর চন্দ্র রায়

শাহ্ মোঃ জুলফিকার রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

সজীব কুমার দে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মঞ্জুর আহমেদ

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

কে. এম. ইউসুফ আলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী

অষ্টম শ্রেণির এই বইয়ে তোমাকে স্বাগতম।

এই বইটি তোমাকে নতুন নতুন কাজের মধ্য দিয়ে কিছু নতুন অভিজ্ঞতা দেবে। তোমরা নিজেদের জীবনে কীভাবে এই অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাবে, ঈশ্বরের অপার মহিমা জেনে মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবে সেই বিষয়ের অনেক কথা এই বইয়ে লেখা আছে।

অষ্টম শ্রেণির এই বইটিতে ফিল্ডট্রিপ, ছবি আঁকা, আলপনা দেওয়া, নাটিকা, গান, ভজন, কীর্তন, মন্ডপসজ্জা, কবিতাসহ এ রকম আরও অনেক আনন্দময় বিষয় তুমি জানতে পারবে। এ সকল বিষয়ের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন কাজ তুমি কীভাবে করবে তাই জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বিভিন্ন শিরোনামে এই বইয়ে হিন্দুধর্মের কিছু মূলকথা তোমাদের জানানো হয়েছে। দেখতে পাবে, বইটার মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, দেবদেবী এবং অবতারগণের জীবনী এবং খেলার ছলে কিছু কাজ করার কথা বলা হয়েছে।

এই বইয়ে ধর্মের বিষয়বস্তুসমূহ ধর্ম নিয়ে হলেও তা কিন্তু বেশ আনন্দদায়কও। বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে হিন্দুধর্মের মূল বক্তব্য তুমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে এবং তা অনুসরণ করে সুন্দর জীবন গড়তে পারবে। তোমার মনে আরও কোনো প্রশ্ন এলে সে প্রশ্নগুলো তোমার শিক্ষক, বাবা-মা/ অভিভাবক বা বন্ধুকে করতে পার।

তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা এবং শুভকামনা। চলো আমরা আনন্দের মধ্যদিয়ে, কাজের মধ্যদিয়ে, অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের অষ্টম শ্রেণির জন্য যোগ্যতাগুলো অর্জন করি।

হিন্দুধর্ম শিক্ষা তোমার জন্য অনেক আনন্দের হোক, এই কামনা।

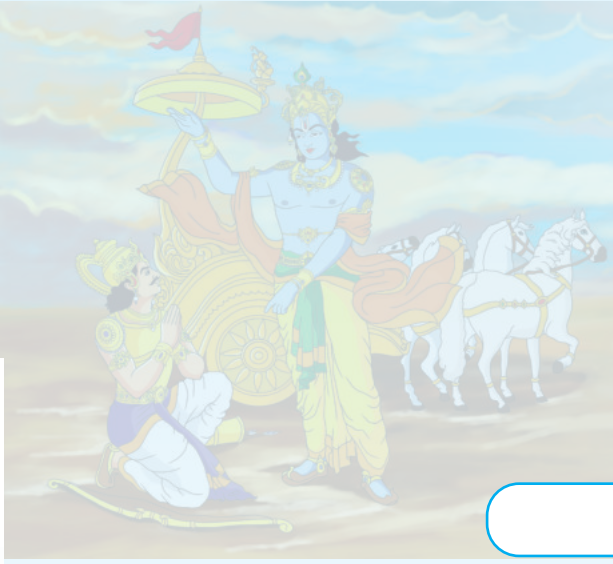

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ:

হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়াবলি	১ - ১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু	১২ - ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ:

যোগাসন	২৫ - ৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

ধর্মাচার ও পূজা-অর্চনা	৩৭ - ৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:

তীর্থক্ষেত্র	৪৭ - ৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ:

মূল্যবোধ চর্চা	৬০ - ৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

আদর্শ জীবনচরিত ও ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান	৭৬ - ১১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:

পরমতসহিষ্ণুতা	১১২ - ১২৩

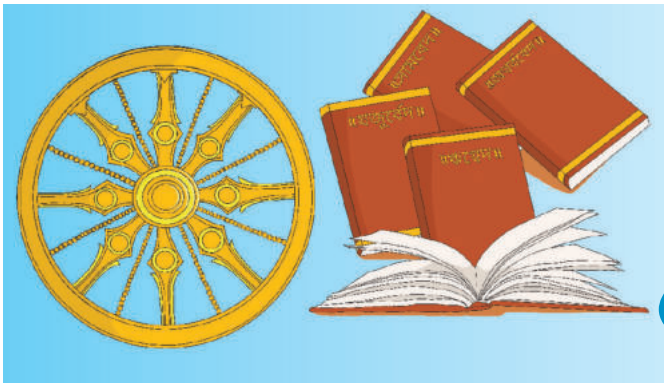

প্রথম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়াবলি

চলো, আমরা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে নিজের জানা তথ্যগুলো লিখে ‘হিন্দুধর্ম তথ্যবৃক্ষ’ পূরণ করি।

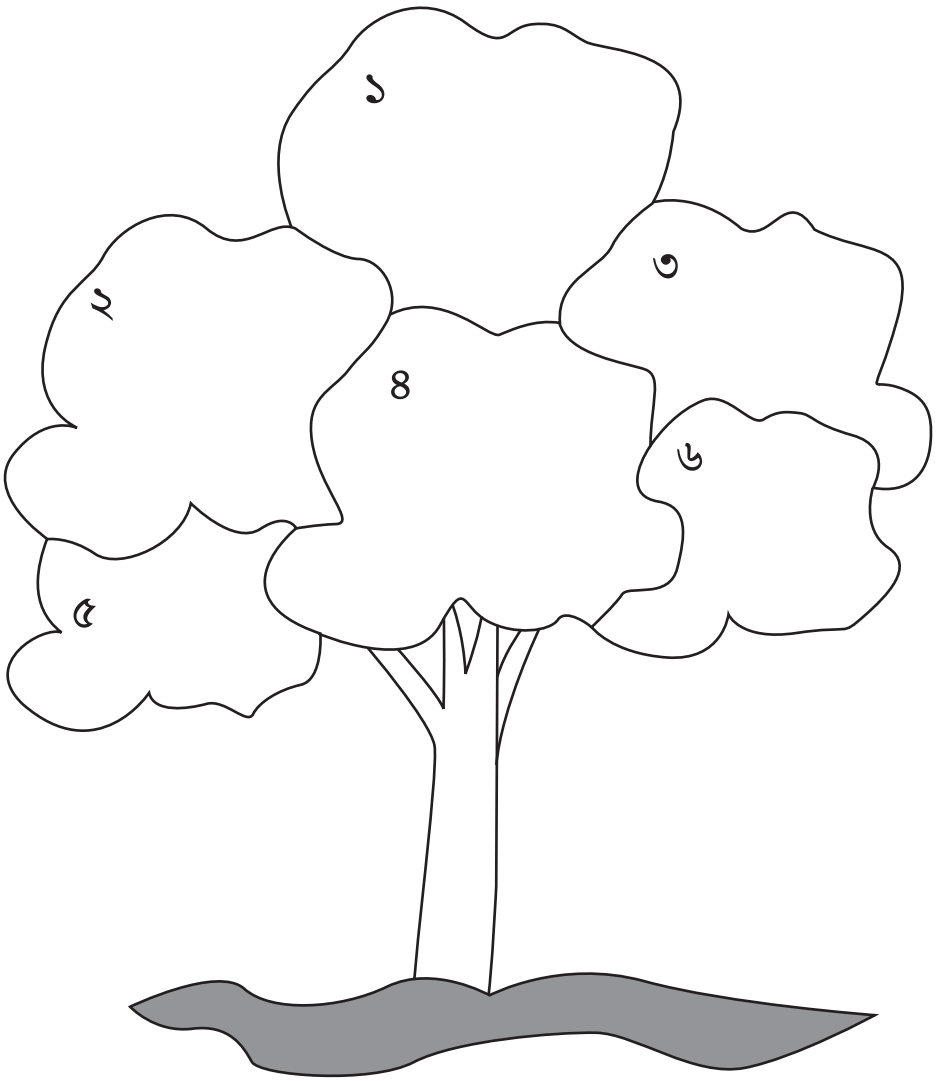

- দলের সকলের তথ্যবৃক্ষ থেকে তথ্য নিয়ে এককভাবে 'হিন্দুধর্ম তথ্যছক' পূরণ করি।

ছক ১.১: হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত তথ্য

প্রতিটি ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস আছে। এসব বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ধর্মটি পরিচালিত হয়। ধর্মাবলম্বীরা সেই বিশ্বাসের আলোকে নিজ জীবনের গতিপথ ঠিক করে নেন। হিন্দুধর্মও এর ব্যতিক্রম নয়। সুমহান এই প্রাচীন ধর্মটি হাজার হাজার বছর ধরে মুনি-ঋষিদের সাধনা ও উপলব্ধির ফসল। এখানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথ ও চিন্তা আছে, তেমনি কিছু কিছু বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন। হিন্দুধর্মের যেসব বিষয়ে সকলে সহমত, সেগুলোই হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়। এ রকম কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ব্রহ্ম

বেদের একটি অংশ উপনিষদ। এখানে ব্রহ্ম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়েছে। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ যা অপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক আর কিছু হতে পারে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উল্লেখ আছে ঋষি ভৃগু পিতা বরুণের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, ব্রহ্ম কী?

উত্তরে পিতা বলেছিলেন, এই ভূতসমূহ (পৃথিবী সৃষ্টির মৌলিক উপাদানকে ভূত বলা হয়) যাঁ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যাঁর দ্বারা টিকে আছে এবং বিনাশের পর যাঁতে লীন হয়ে যায়, তুমি তাঁকে বিশেষরূপে জানতে চাও, তিনিই ব্রহ্ম।

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে যেসব ধারণা পাওয়া যায়—

১. যিনি সকল জীব ও বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। সর্বত্র বিরাজ করছেন ব্রহ্ম। তাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি। তাঁতেই জগৎ মিলিয়ে যায়। তাঁতেই জীবিত থাকে।

২. ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হলেও তিনি কিন্তু একই। অর্থাৎ বহুত্বের মধ্যে একত্ব। আগুন এক এক জায়গায় এক এক রূপ ধারণ করে। কিন্তু আগুন তো শেষমেশ আগুনই থেকে যায়।

৩. তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আবার জগতের অভ্যন্তরে থেকেই

জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। মাকড়সা যেমন নিজের শরীর থেকেই জাল বোনে আবার সেই জালের মধ্যেই অবস্থান করে।

৪. ব্রহ্ম অমৃত স্বরূপ। তিনি এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন অমৃত আস্বাদনের জন্য। রসের আরেক রূপ অমৃত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মানুষকে অমৃতের পুত্র বলা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে বলেছিলেন, 'অমৃতের পুত্র কী মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চান না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্য-ভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ।'

৫. ব্রহ্ম রস আস্বাদন করে আনন্দ পান। ব্রহ্মের এ আনন্দ থেকে পঞ্চভূত অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ সৃষ্টি হয়েছে। 'ওঁ' শব্দকে ব্রহ্মের প্রতীক বলা হয়।

ব্রহ্মকে বলা হয় ত্রিগুণাতীত। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে স্বত্ত্ব (ইতিবাচক), রজঃ (কর্মোদ্যম) এবং তমঃ (নেতিবাচক) এই তিনটি গুণের কোনোটিরই প্রকাশ নেই। তাঁকে কোনো উপাধিতে ভূষিত করা যায় না। এই ব্রহ্মকে 'নিরুপাধিক' ব্রহ্ম বলা হয়। এই রূপে তিনি এক ও অদ্বিতীয়, নিরাকার পরমব্রহ্ম; তিনি অন্তহীন এবং ব্রহ্মাণ্ডজুড়ে বিরাজমান।

আবার ব্রহ্মের আরও একটি রূপ আছে তার নাম হলো 'সোপাধিক' ব্রহ্ম। এই রূপে তিনি উপাধিযুক্ত। অর্থাৎ তাঁকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যেমন ব্রহ্ম যখন জীবের সকল কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। এখানে 'ঈশ্বর' হলো তাঁর উপাধি। ঈশ্বরকে আমরা ভগবানও বলি। 'ভগ' শব্দের অর্থ— ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ছয়টি গুণ আছে বলে ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়।

- আমরা প্রত্যেকে ব্রহ্ম সম্পর্কে একটি/ কয়েকটি বাক্য বলি।
- সকলের বলা বাক্যের মধ্য থেকে আমার ভালোলাগা তিনটি বাক্য ব্রহ্মের ধারণা সম্পর্কে ছকে লিখে রাখি।

ছক ১.১: ব্রহ্মের ধারণা

	ব্রহ্ম	বাক্য
১.		
২.		
৩.		

জন্মান্তর

সবাই ছবি দুটো মনোযোগ দিয়ে দেখি। ছবিতে কী বোঝানো হচ্ছে, প্রত্যেকে নিজের মতন করে বলি।

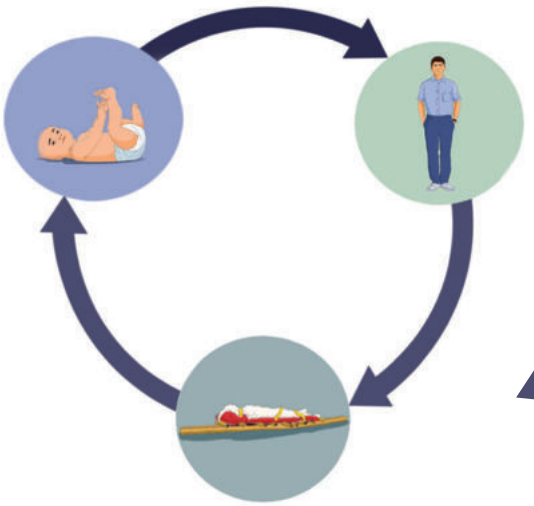

জন্মান্তরের চক্র

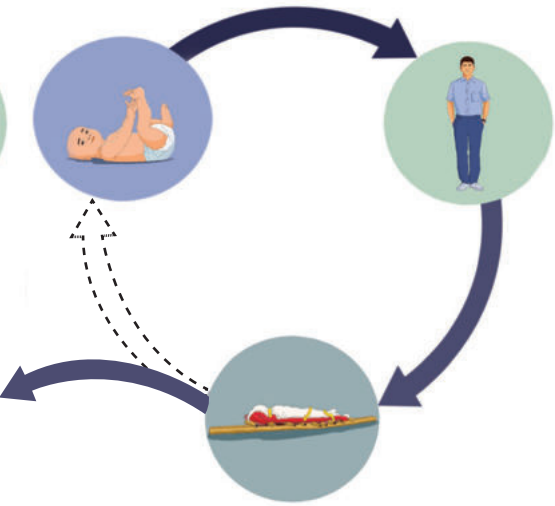

মোক্ষলাভের প্রবাহচিত্র

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, রথকে চালানোর জন্য যেমন রথী থাকে, তেমনি মানুষের দেহকে পরিচালনার জন্য যে সত্তা আছে তাই আত্মা। এই আত্মা দুভাবে প্রকাশিত হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ব্রহ্ম হচ্ছেন পরমাত্মা। সেই আত্মারই একটি অংশ আমরা ধারণ করে আছি জীবাত্মা রূপে।

সূর্য যদি পরমাত্মা হয়, আমরা যেন তার এক একটি আলোককণা। পরমাত্মা থেকে যেমন জীবাত্মার সৃষ্টি হয়, তেমনি এটি পরমাত্মায় মিলিয়েও যায়। এর ধ্বংস বা বিনাশ নেই। গীতায় আত্মার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, শস্ত্র (এক ধরনের অস্ত্র) একে ছিন্ন করতে পারে না। আগুন একে দগ্ধ করতে পারে না। জলও আর্দ্র করতে পারে না। বায়ু পারে না শুষ্ক করতে।

এই আত্মা এক দেহ থেকে আরেক দেহে স্থানান্তরিত হয়। গীতায় এ সম্পর্কে হয়েছে:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২/২২

অর্থাৎ, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে।

মৃত্যুর পর আবার জন্ম নেয়াকে জন্মান্তর বলা হয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর গতজন্মের কর্ম অনুসারে একজন মানুষ নতুন জন্মলাভ করে অথবা মোক্ষলাভ করে।

জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রকে ভবচক্র বলা হয়।

মোক্ষলাভ (মুক্তি)

মানুষ জন্মলাভ করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে জীবন কাটায়, তারপর মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পরে মানুষ মোক্ষলাভ করে অথবা আবার জন্ম নেয়। হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করা হয়, জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্র থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষের প্রধান লক্ষ্য। এই মুক্তিকে বলা হয় মোক্ষ বা নির্বাণ বা অমৃতলাভ। মুক্তিলাভ করলে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশে যায়; দুঃখ জরা গ্লানি আর মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না।

মোক্ষলাভ হলে মানুষ কামনা-বাসনা থেকে মুক্তি পায়, নিজের সমস্ত কাজ এবং কাজের ফলাফল ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করে। পাত্রের জলের যেমন আলাদা অবস্থান থাকে কিন্তু পাত্রকে ভেঙে দিলে সে বৃহৎ জলের সঙ্গে মিশে যায়। তেমনি জীবাত্মাও মোক্ষলাভ করে পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়।

কিন্তু মুক্তি লাভের উপায় কী? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩৮) বলা হয়েছে, হে বিশ্বাসী নরনারী ও দিব্যধামবাসী! তোমরা শোনো, আমি অন্ধকারের ওপারে অবস্থিত সেই জ্যোতির্ময় পুরাণ পুরুষকে জেনেছি এবং জেনে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছি। ইহা ব্যতীত অমৃত লাভের অন্য কোনো উপায় নেই।

জ্যোতির্ময় পুরাণ পুরুষ হচ্ছেন ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্মকে না জানা পর্যন্ত মুক্তির উপায় নেই।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় হলো সাধনা। হিন্দুধর্মে সাধনার তিনটি পথের কথা বলা হয়েছে।

বৈরাগ্য সাধনা: কোনোকিছুর প্রতি আসক্ত না হয়ে কেবল ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। যিনি বৈরাগ্য সাধনা করেন তিনি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর আমার সব দায়িত্ব নিয়েছেন, আমার আর ঈশ্বরের সত্তার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

যোগাভ্যাস: যোগের অভ্যাস হচ্ছে যোগাভ্যাস। যোগ শব্দের অর্থ যুক্ত হওয়া। এখানে যোগাভ্যাস অর্থ পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, তাঁর সান্নিধ্যলাভ। যোগের অর্থ পরমেশ্বরের তাঁর সান্নিধ্যলাভ। যোগাভ্যাস করার জন্য কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়— সংযম, নিয়ম, বিভিন্ন আসন, শ্বাসচর্চা, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ, সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদি।

ভক্তি: পরমেশ্বরের প্রতি ভালোবাসাকে ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে ভক্তি। আত্মীয়-পরিজনের প্রতি ভালোবাসার উর্ধ্বে ভগবানের প্রতি এই ভালোবাসা। ভক্ত এখানে ঈশ্বরকে খুব কাছের এবং আপন বলে ভাবেন। ভাবতে ভাবতে তিনি সবকিছুতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখতে পান। নানারকম পূজা-পার্বণ, ধ্যান, মন্ত্র ইত্যাদির সমন্বয়ে এই সাধনপথ তৈরি হয়েছে।

- আমরা প্রত্যেকে পুনর্জন্ম অথবা মোক্ষলাভের পক্ষে 'পুনর্জন্ম কিংবা মোক্ষলাভ' ছকে নিজের মতামত লিখি।

ছক ১.৩: হিন্দুধর্ম তথ্য

	পুনর্জন্ম	মোক্ষলাভ
তুমি কোনটি চাও? (টিক দাও)		
কেন চাও তা দুটি যুক্তি দিয়ে বোঝাও।		

অবতার

ঈশ্বর তাঁর মহামায়া শক্তিকে অবলম্বন করে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জন্য তিনটি রূপ ধারণ করেন— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। বিষ্ণু ঈশ্বরের জগৎ-পালক রূপ। জগৎ রক্ষায় বিষ্ণু বিভিন্ন সময়ে মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পৃথিবীতে যখনই ধর্মের অধঃপতন এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ঈশ্বর যখন ধর্ম রক্ষার জন্য দেহধারণ করে পৃথিবীতে আসেন তখন তাঁকে অবতার বলা হয়। 'অবতার ' শব্দের অর্থ যিনি নিজের অবস্থান থেকে অবতরণ করেন।

ঈশ্বর নিরাকার। তিনি এক এবং অভিন্ন। বিভিন্ন দেবদেবী ও অবতার নিরাকার ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ।

পুরাণে বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা বলা হয়েছে। সংক্ষেপে একে দশাবতার বলা হয়।

দশাবতার-পরিচয়

মৎস্য অবতার

কূর্ম অবতার

বরাহ অবতার

নৃসিংহ অবতার

বামন অবতার

পরশুরাম অবতার

রাম অবতার

বলরাম অবতার

বুদ্ধ অবতার

কল্কি অবতার

ছক ১.৪: দশ অবতার

নাম	সময়কাল	রূপ	অবতরণের উদ্দেশ্য
মৎস্য	সত্যযুগ	মৎস্য	জলের প্লাবন থেকে সকল জীবকে রক্ষা করা
কূর্ম	সত্যযুগ	কূর্ম	প্লাবনে ডুবে যাওয়া দ্রব্যাদি উদ্ধার করা
বরাহ	সত্যযুগ	বরাহ	দানব হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক ডুবিয়ে দেওয়া পৃথিবীকে সমুদ্রের তলা থেকে তুলে আনা
নৃসিংহ	সত্যযুগ	অর্ধ মানুষ, অর্ধ সিংহ	দানব হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা
বামন	ত্রেতাযুগ	বামনাকৃতির মানব	দৈত্যরাজ বলীকে দমন করে পৃথিবীকে রক্ষা করা
পরশুরাম	ত্রেতাযুগ	মানুষ	অত্যাচারীর হাত থেকে ধার্মিকদের রক্ষা করা
রাম	ত্রেতাযুগ	মানুষ	সত্যরক্ষা, ন্যায়প্রতিষ্ঠা

বলরাম	দ্বাপর	মানুষ	ধর্মপ্রতিষ্ঠা
বুদ্ধ	খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩২-৫৪৩ অব্দ	মানুষ	দুঃখ থেকে মুক্তির পথ দেখানো
কল্কি	কলিযুগের শেষে (অবতীর্ণ হবেন)	মানুষ	অন্যায়কারীদের বিনাশ করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা

- চলো, আমরা প্রত্যেকে নিজের পছন্দের অবতারকে নিয়ে 'পোস্টারে অবতার' কাজটি করি। এখানে একটি সুন্দর পোস্টার তৈরি করব। পোস্টারে সংশ্লিষ্ট অবতারের যে-কোনো একটি কাজের ছবি আঁকব/সাঁটাব, তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য লিখব এবং অলঙ্করণ করব।

চতুরাশ্রম

চতুর্বর্গ

হিন্দুধর্মের প্রধান লক্ষ্য মুক্তি বা মোক্ষলাভ হলেও বাস্তবজীবনের প্রয়োজনকে কখনো অস্বীকার করা হয়নি। বাস্তবজীবনের আরো তিন লক্ষ্য আছে— ধর্ম (ন্যায়পরায়ণতা), অর্থ (ধন-সম্পদ) এবং কাম/ কামনা। এভাবে ধর্ম, আর্থ, কাম ও মোক্ষ এ চারটিকে একসঙ্গে চতুর্বর্গ বলা হয়।

চতুরাশ্রম

চতুর্বর্গের সঙ্গে সংগতি রেখে জীবনকেও চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হলো— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য. বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। একে সংক্ষেপে চতুরাশ্রম বলা হয়।

ব্রহ্মচর্য: শৈশবে বেদ-বিদ্যা লাভ ও শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনের জন্য গুরুগৃহে যেতে হবে। সেখানে আবাসিক ছাত্র হিসেবে অবস্থান করে, গুরুর ও গুরুমাতার সেবা করে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভ করবে। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করবে।

গার্হস্থ্য: ব্রহ্মচর্য আশ্রম শেষে বাড়ি ফিরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। তারপর শুরু হবে গার্হস্থ্য জীবন। পিতা-মাতার সেবা, পরিবারের প্রতিপালন, আত্মীয়-স্বজন ও অতিথি সেবা, পুত্র-কন্যার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি করতে হবে।

বানপ্রস্থ: পঁচিশ বছর গার্হস্থ্য জীবন পালনের পর তৃতীয় আশ্রমের শুরু হয়। বানপ্রস্থ আশ্রমের মূল মন্ত্র হলো ‘ভোগবর্জিত ত্যাগ’। চিত্তের পরিশুদ্ধির জন্য তীর্থ ও মন্দির পরিদর্শনের মধ্যে দিয়ে এ আশ্রমের সূচনা। সাধনা ও কৃচ্ছ্র সাধনের জন্য বনে যাত্রা করা কর্তব্য।

সন্ন্যাস: মোক্ষলাভের চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার জন্য সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশ করতে হবে। শাস্ত্রানুসারে পঁচিশ বছর বানপ্রস্থ শেষে সন্যাস গ্রহণ করতে হবে। ধ্যান ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন করতে হবে।

কলিযুগে মানুষের আয়ুষ্কাল কম হওয়ায় চতুরাশ্রমের প্রচলন তেমনভাবে নেই।

যুগধর্ম

- আমাদের পূর্ব পুরুষগণ পালন করতেন এ রকম তিনটি ধর্মীয় নিয়ম কিংবা প্রথার কথা লিখে 'পুরোনো দিনের কথা' তালিকাটি তৈরি করি।

ছক ১.৫: পুরোনো দিনের কথা

নিয়ম/ প্রথার শিরোনাম	যেভাবে পালন করতেন

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমাদের ধর্মে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিয়ম ও প্রথার পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের ধর্মের সবচেয়ে সুন্দর দিক এই গতিশীলতা। যুগের সঙ্গে ধর্মের রীতি-নীতি পরিবর্তনের কথা ধর্মেই বলা হয়েছে।

হিন্দুধর্মের গ্রন্থগুলো দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি অংশে আছে বেদ। এখানে আত্মার প্রকৃতি, ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। এসব ধারণা চিরন্তনী। পরিবর্তনের সুযোগ নেই।

স্মৃতি অংশে রয়েছে বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র, যেমন- পুরাণ। এতে জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, নিয়ম ও রীতি-নীতি রয়েছে। কিন্তু এক যুগের নিয়ম-কানুন আরেক যুগের নিয়ম-কানুন থেকে ভিন্ন। যুগের সঙ্গে সঙ্গে প্রথা ও নিয়মের পরিবর্তনকে যুগধর্ম বলা হয়।

শাস্ত্রে কোন যুগে কেমন ধর্ম হবে তাও বলা হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সময়কালকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ। সত্যযুগে সবাই সত্য কথা বলত। সৎ পথে চলত। কিন্তু ত্রেতাযুগে তা এক চতুর্থাংশ কমে আসে। পরের দুই যুগেও সমান পরিমাণে কমে আসে। এখন কলিযুগ চলছে। অর্থাৎ চতুর্থ যুগ। এই যুগের পর সত্য ফুরিয়ে যাবে। আবার নতুন করে সত্যযুগের শুরু হবে। এভাবে যুগচক্র চলবে।

মনুসংহিতায় এক এক যুগে এক একটি কর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে।।

(মনুসংহিতা, ১।৮৬)

সরলার্থ: সত্যযুগে তপস্যাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ত্রেতাযুগে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, দ্বাপর যুগে যজ্ঞ এবং কলিতে একমাত্র দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

- হিন্দুধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ নিয়ে আমরা যে শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি সেই প্রদর্শনী থেকে পাওয়া এমন একটি শিক্ষার কথা 'জীবনদর্শন' ছকে লিখি যা আমার জীবনে কাজে লাগবে বলে মনে করছি।

ছক ১.৬: 'জীবনদর্শন' ছক

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু

স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাহিত্য প্রতিযোগিতা কিংবা অন্যান্য বড় কোনো অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ থেকে কোনো একটি অংশ পাঠ করা হয়। আমাদের ধর্মের ক্ষেত্রে গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করা হয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে অনেকেই গীতা পাঠ করতে পারি আবার কেউ কেউ পারি না। তবে গীতা পাঠের পর গীতার শ্লোকের যে অর্থ বলা হয়, তা শুনতে বেশ ভালো লাগে। সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারি। আমরা নিজেরা যদি গীতা পড়তে পাড়ি তাহলে তো বেশ ভলোই হতো। আচ্ছা আজ আমরা যদি আমাদের ক্লাসেই একটি গীতাপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করি, তবে কেমন হয়? আমাদের হিন্দুধর্মের শিক্ষককে বিচারক হিসেবে রেখে আমরা গীতাপাঠ প্রতিযোগিতার একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারি।

এসো, এর জন্য নিজেরা জানি এমন কোনো শ্লোক বা নিচে প্রদত্ত চারটি শ্লোকের মধ্যে থেকে যে-কোনো একটি শ্লোক কয়েকবার অনুশীলন করি। এরপর প্রতিযোগিতার নিয়ম মেনে তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করি। সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দে পাঠের জন্য শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারি।

১. নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ । শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ।। (গীতা, ৩/ ৮) **সরলার্থ:** তুমি সর্বদা কাজ করো। কাজ না করার চেয়ে কাজ করা শ্রেষ্ঠ। কাজ না করলে তোমার জীবনযাত্রাও পরিচালিত হবে না।	২. রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ । আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ (গীতা ২/৬৪) **সরলার্থ:** সংযতচিত্ত মানুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি ও অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁর বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে ভগবানের কৃপা লাভ করেন।
৩. ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ (গীতা, ২/৬৩) **সরলার্থ:** ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়।	৪. শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।। (গীতা, ৪/৩৯) **সরলার্থ:** যিনি শ্রদ্ধাবান, তৎপর ও সংযত-ইন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করে অচিরেই তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।

- প্রতিযোগিতায় কে কীভাবে গীতার শ্লোকটি উপস্থাপন করেছে তা পর্যবেক্ষণ করি।
- আমরা গীতাপাঠ করে যা বুঝেছি তা দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে এককভাবে সকলের সামনে বলি।
- শ্লোকগুলো থেকে যা বুঝেছি তা অল্প কথায় 'গীতাদর্শন' ছকে লিখি।

ছক ১.৭: গীতাদর্শন

গীতাপাঠ বিধি

আমরা গীতাপাঠ প্রতিযোগিতায় দেখলাম সবাই একইভাবে বা নিয়মে গীতা পাঠ করেনি। আবার অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা পূজায় যেভাবে গীতা পাঠ করা হয়ে থাকে তা স্কুলের অনুষ্ঠানের গীতা পাঠের মতো নয়। তবে সব ক্ষেত্রেই কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে গীতা পাঠ করা হয়। সাধারণত গীতা পাঠের শুরুতে বিভিন্ন মঙ্গলাচরণ শ্লোক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল শ্লোক, তার অর্থ ও তাৎপর্যসহ পাঠ, পরিশেষে গীতার মাহাত্ম্য পাঠ ও সব শেষে শান্তিপাঠ করা হয়। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের শুরুতে যখন গীতাপাঠ করা হয় তখন সংক্ষিপ্ত আকারে তা করা হয়ে থাকে। এবার আমরা স্কুলে বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র গীতা পাঠ কীভাবে করি তা জানব। এরপর যে কোনো অনুষ্ঠানে সহজেই গীতাপাঠ করতে পারব।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতাপাঠের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

ধারাবহিকভাবে এটি অনুসরণ করে গীতাপাঠ সম্পন্ন করতে হবে।

১.	ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
২.	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ-অধ্যায়ের জ্ঞানযোগ থেকে ৩৮ নং শ্লোকটি পাঠ করছি
	শ্রীভগবান্ উবাচ ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।
	সরলার্থ: এই জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই। কর্মযোগে সিদ্ধপুরুষ সেই জ্ঞান কালক্রমে নিজের অন্তরে নিজেই লাভ করেন।
৩.	সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখভাগ্ভবেৎ।।
	সরলার্থ: জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক, সকলেই আরোগ্য লাভ করুক, সকল মানুষ পরম শান্তি লাভ করুক, কখনো কেউ যেন কেহ দুঃখ বোধ না করেন।
৪.	ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পরিচয়

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের রথের সারথি। যুদ্ধের শুরুতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধ করার প্রেরণা দেন। সেজন্য তিনি কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। সেসব উপদেশের সংকলনই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। গীতা মহাভারতের একটি অংশ। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে (২৫—৪২ অধ্যায়) গীতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রয়েছে। তবুও গুরুত্ব বিবেচনায় মহাভারতের এই অংশটি পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। গীতায় শ্লোকসংখ্যা সাতশত। তাই একে সপ্তশতীও বলা হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ

ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র— দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রমুখ। এঁদের বলা হয় কৌরব। অন্যদিকে পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র— যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। এঁদের বলা হয় পাণ্ডব। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন। তাই বড় ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজা হতে পারেননি। তাঁর বদলে রাজা হন ছোট ভাই পাণ্ডু। অতএব, নিয়ম অনুসারে পাণ্ডুর বড় ছেলে যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়ার কথা। কিন্তু কৌরবরা পাশা খেলায় কপটতা করে পাণ্ডবদের পরাজিত করেন। তাঁদের বনবাসে পাঠিয়ে দুর্যোধন অন্যায়ভাবে রাজা হন। বনবাস থেকে ফিরে এসে পাণ্ডবরা নিজেদের রাজ্য ফেরত চান। কিন্তু দুর্যোধন যুদ্ধ ছাড়া রাজ্য ফিরিয়ে দিতে রাজি নন।

ফলে হারানো রাজত্ব উদ্ধারের জন্য কুরু-পাণ্ডব দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। অধার্মিক ও দুর্বৃত্তদের বিনাশ এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য এই যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয় বলে এর নাম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মোট আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়কে বলা হয় যোগ। প্রতিটি অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। এখানে আমরা গীতার প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানব।

অর্জুনবিষাদ-যোগ: কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শুরুতে প্রতিপক্ষে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে অর্জুনের মন বিষাদে ভরে ওঠে। আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা ছাড়া যুদ্ধজয়ের কোনো বিকল্প নেই। তাঁর শরীর কাঁপতে থাকে। গলা শুকিয়ে যায়। দেহ অবসন্ন হয়। হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ে। এই অবস্থায় তিনি যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেন। ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের উপর বসে পড়েন।

সাংখ্যযোগ: সাংখ্য শব্দের অর্থ সম্যক জ্ঞান। সম্যক বিচার-বুদ্ধি। এই অধ্যায় থেকেই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান শুরু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে হতাশা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াতে উপদেশ দেন। তারপর তিনি অর্জুনের কাছে দেহের নশ্বরতা, আত্মার অবিনশ্বরতা, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, কর্মযোগের প্রারম্ভিক জ্ঞান বর্ণনা করেন। অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

কর্মযোগ: নিজের বৃত্তি ও ধর্ম অনুসারে কর্তব্যকর্ম করা, আমি কর্ম করি এই অহংবোধ ত্যাগ করা, জ্ঞানের সাথে কর্ম করা ইত্যাদি কর্মযোগের মূল বিষয়।

জ্ঞানযোগ: জ্ঞানের লক্ষণ, জ্ঞান লাভের উপায়, জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি জ্ঞানযোগের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ভগবানের অবতারতত্ত্ব এবং ব্যক্তির গুণ, পেশাভিত্তিক কর্ম আলোচিত হয়েছে।

সন্ন্যাসযোগ: প্রকৃত সন্ন্যাসীর তাৎপর্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ, আমি করি এই অহংবোধ ত্যাগ— এটাই সন্ন্যাসযোগের মূল কথা। সংসারে থেকেও এভাবে প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভব। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর চেয়েও গৃহী সন্ন্যাসী উত্তম।

অভ্যাস বা ধ্যানযোগ: ধ্যানের উন্নতির জন্য নিয়মিত চর্চা বা অভ্যাস প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে ধ্যানের স্থান, কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করার জন্য নিয়মিত যোগাভ্যাস প্রয়োজন। অন্তর্মুখী ব্যক্তি দুঃখে বিচলিত হন না। সর্বভূতে পরমাত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে তিনি পরমানন্দ লাভ করেন। এসব বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে।

জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগ: অপরা ও পরা ভেদে প্রকৃতি দুই প্রকার। পঞ্চভূতের সাথে মন, বুদ্ধি ও অহংকার যোগ হয়ে অপরাপ্রকৃতি সৃষ্টি হয়। জীবের মধ্যে স্থিত চেতনপুরুষই পরাপ্রকৃতি। অপরা ও পরা মিলেই বিশ্বজগতের সৃষ্টি। এটাই জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগের বিষয়বস্তু।

অক্ষরব্রহ্ম-যোগ: ক্ষর অর্থ বিনাশ। অক্ষর মানে অবিনাশ। পরমেশ্বরের নির্গুণভাবই অক্ষর। তিনিই নিরাকার ব্রহ্ম। এখানে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্রহ্মের উপাসনা এবং ব্রহ্মচিন্তার ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহী করতে এসব বিষয় আলোচিত হয়েছে।

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ: রাজবিদ্যা অর্থ শ্রেষ্ঠবিদ্যা এবং রাজগুহ্য অর্থ শ্রেষ্ঠ রহস্যময় বিদ্যা। শ্রেষ্ঠ ও রহস্যময় বিদ্যাই এই যোগের আলোচ্য বিষয়। পরমেশ্বর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণে বশীভূত নন। এঁকে বলা হয় নির্গুণ ব্রহ্ম। আবার ভক্তের জন্য তিনি গুণের দ্বারা বশীভূত হন। তাঁকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম। সেক্ষেত্রে তিনিই স্রষ্টা, তিনি সৃষ্টি। তিনিই কর্মকর্তা, তিনিই কর্মফলদাতা। পত্র-পুষ্প-ফলে, জলে ভক্তিসহকারে ভজনার দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায়। ভগবানের এই উদার ও সর্বজনীন রূপ এখানে আলোচিত হয়েছে।

বিভূতিযোগ: বিভূতি শব্দের অর্থ মহিমাময় রূপ, বিবিধ সৃষ্টি। প্রকৃতির মাঝে পরমেশ্বর যে-রূপে বিরাজমান তাই তাঁর বিভূতি। গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বাতাস সবকিছুর মধ্যে তিনি রয়েছেন। দৃশ্যমান জগৎ তাঁর একটি অংশমাত্র। তাঁর পূর্ণ মহিমা অকল্পনীয়, অচিন্তনীয়।

বিশ্বরূপদর্শন-যোগ: বিশ্বরূপের অর্থ ভগবানের ঐশ্বরিক রূপ। তাঁর অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত চরণ। তাঁর আদি, অন্ত বা মধ্য নেই। স্থাবর-অস্থাবর, দেব-দানব জগতের সবকিছুই তাঁর মধ্যে রয়েছে। অর্জুন এসব দেখে ভীত হয়ে ভগবানকে সৌম্য মনুষ্যরূপ ধারণ করার জন্য প্রার্থনা করেন।

ভক্তিযোগ: ভগবানের প্রতি ভক্তের আন্তরিক ভালোবাসাই ভক্তি। ভক্তের কাছে তিনি সাকার রূপে আবির্ভূত হন। যিনি সকল জীবপ্রকৃতিকে ভালোবাসেন, দয়া করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব। এগুলো ভক্তিযোগের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ: ক্ষেত্র অর্থ জমি। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থ জমি সম্পর্কে যিনি জানেন। সুখ-দুঃখের অনুভূতিযুক্ত শরীরই ক্ষেত্র এবং পরমেশ্বরই এর ক্ষেত্রজ্ঞ। এই জ্ঞান লাভ করলে অবিদ্যা নাশ হয়। মোক্ষ লাভ হয়।

গুণত্রয়-বিভাগযোগ: এখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিন গুণের বৈশিষ্ট্য, গুণের দ্বারা আত্মার বন্ধনপ্রক্রিয়া, ত্রিগুণাতীতের বৈশিষ্ট্য, ভক্তকর্তৃক গুণকে অতিক্রম ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পুরুষোত্তম-যোগ: এখানে পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম পুরুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। জীবপ্রকৃতির মধ্যে স্থিত পরিণামী পুরুষকে বলা হয় ক্ষরপুরুষ। আবার, নির্গুণ ব্রহ্মই অবিনাশী অক্ষর পুরুষ। ক্ষর ও অক্ষরের ঊর্ধ্বে যে পুরুষ তিনি পুরুষোত্তম। মোহমুক্ত হয়ে সেই পুরুষোত্তমের ভজনায় সর্বজ্ঞ হওয়া সম্ভব।

দৈবাসুরসম্পদ-বিভাগযোগ: দৈবিক ও আসুরিক ভাব সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, সংযম, দান, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য, শুচিতা ইত্যাদি দৈবীভাব। দম্ভ, অহংকার, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি আসুরিকভাব।

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ: শ্রদ্ধা অর্থ বিশ্বাস বা আস্থা। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে শ্রদ্ধা তিন প্রকার। অনুরূপভাবে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান— প্রতিটি তিনভাগে বিভক্ত। এই অধ্যায়ে শ্রদ্ধা, আহার, দানাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক দান অনুশীলনের জন্য অর্জুনকে এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

মোক্ষযোগ: মোক্ষ অর্থ মুক্তি। ভগবানকে পাওয়ার মাধ্যমে মোক্ষ লাভ হয়। কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণ নিলেই ভক্তের মোক্ষলাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনে ভক্ত অর্জুনের মোক্ষ লাভ হয়েছিল। তিনি সংশয়শূন্য মনে ধর্মযুদ্ধ করতে সম্মত হন—এসব বিষয় এখানে বলা হয়েছে।

- আমরা প্রত্যেকে নিজের ভালো লেগেছে— গীতার এরকম পাঁচটি যোগের নাম ও কীভাবে সেগুলো নিজের জীবনে কাজে লাগাব তা লিখে 'গীতার যোগ' ছকটি পূরণ করি।

ছক ১.৮: গীতার যোগ

যোগের নাম	আমি যেভাবে কাজে লাগাব

গীতার দর্শন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে একটি দর্শন রয়েছে, যার প্রতিটি বিষয় মানবজীবনের জন্য অনুসরণীয়। সেসবের মধ্য থেকে কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো:

হতাশা বর্জন: আশাই জীবনের চালিকাশক্তি। আশাবাদী মানুষ বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে হতাশাগ্রস্ত মানুষ কাজের শুরুতেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। যার ফলে সে ব্যর্থ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে যুদ্ধের শুরুতেই বিমর্ষভাব ত্যাগ করার উপদেশ দিয়ে বলেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ
নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ
পরন্তপ ।।

(গীতা, ২/৩)

সরলার্থ: হে পার্থ, কাতর হয়ো না, এই কাপুরষতা তোমায় শোভা পায় না। তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াও।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করছেন

কর্মযোগের অনুশীলন: কর্মই জীবন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে কাজ করে যেতে হয়। কাজ না করে জীবন কাটানো সম্ভব নয়। কিন্তু কর্ম করলে মানুষকে ফলভোগ করতে হয়। ভালো কাজের জন্য ভালো ফল। মন্দ কাজের জন্য মন্দ ফল ভোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে গীতার দর্শন হচ্ছে কর্মবিমুখ না হয়ে, কর্মের প্রতি মোহগ্রস্ত না হয়ে, কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করে কাজ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।।

(গীতা, ২/৪৭)

সরলার্থ: কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও নয়। কর্মফল লাভের আশায় তুমি কর্ম করো না, আবার কর্ম ত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

গীতার পরিভাষায় এ ধরনের কর্মকে বলে নিষ্কাম কর্ম। যার অনুশীলনে মানুষকে মোহগ্রস্ত হতে হয় না। কোনো দুঃখকষ্টও তাকে ভোগ করতে হয় না।

প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন: যা দ্বারা কোনো কিছু জানা যায় তাই জ্ঞান। জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে পৃথিবীর উন্নতি হয়েছে। জ্ঞানের মাধ্যমেই জীবন আলোকিত হয়। ভ্রান্ত জ্ঞানে জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। একজন প্রকৃত জ্ঞানীই নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন করতে পারেন। মূঢ় বা অজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগী হওয়া সম্ভব নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।
(গীতা, ৪/৩৮)

সরলার্থ: এই জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই। কর্মযোগে সিদ্ধপুরুষ সেই জ্ঞান কালক্রমে নিজের অন্তরে নিজেই লাভ করেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া: অশান্ত মনে কোনো জটিল বিষয়ের সমাধান হয় না। উল্টো সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়। সমাধানের জন্য প্রয়োজন শান্ত মন। শান্ত মনের মানুষ প্রতিকূল পরিবেশে যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। গীতার পরিভাষায় ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রিত সংযমী শান্ত মনের মানুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়েছে। 'যাঁর দুঃখে উদ্বেগ নেই, সুখের প্রতি স্পৃহা নেই, কাজের প্রতি যাঁর মোহ নেই, ক্রোধ বা বিশেষ ভীতি নেই তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ'। (গীতা, ২/৫৬) অতএব, সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে উঠে মোহশূন্য শান্ত মনে কাজের জন্য এবং সঠিক সমাধানের জন্য মানুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ হতে হবে।

মানবচরিত্রের উন্নয়ন: মানুষের চরিত্র কতগুলো বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি, গীতার পরিভাষায় যাকে গুণ বলা হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ভেদে তা তিন প্রকার। সত্ত্ব গুণ হলো সেই গুণ যা মানুষকে নির্মল সুখের অনুভূতি দেয়, সৃজনশীল করে, সঠিক চিন্তাভাবনা করতে সাহায্য করে। যা মানুষকে চঞ্চল করে, রাগ বাড়িয়ে দেয়, উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তা রজঃ গুণ। যা মোহ সৃষ্টি করে, আলস্য বাড়িয়ে দেয়, ভ্রান্তি বাড়িয়ে দেয়, তা তমঃ গুণ।

যে-গুণের আধিক্য বেশি, ব্যক্তির চরিত্রে সেই বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায়। একজন ভালো মানুষের সবকিছু ভালো, খারাপ মানুষের সবকিছু খারাপ, এমনটি নয়। নিজের সহপাঠী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বিরূপ আচরণকে এই দৃষ্টিতে বিচার করলে মনে কোনো ক্ষোভ বা অস্বস্তি থাকে না। নিয়মিত সৎসঙ্গ, সৎকাজের সাথে যুক্ত থাকার মাধ্যমে গুণের পরিবর্তন করা সম্ভব। তমঃ থেকে রজঃ বা রজঃ থেকে সত্ত্ব গুণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন করা সম্ভব। এই দর্শনকে অনুসরণ করে মানুষ তার চরিত্রের উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি: ঈশ্বর আত্মারূপে সর্বভূতে বিরাজমান। গাছ-পালা, জীবজন্তু, প্রকৃতি সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। গীতার ভাষায়, "সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" (গীতা, ১৫/১৫)— আমি সকল জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করি। এই দর্শন ধারণ করে সর্বজীবের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করা যায়। ফলে মনের হিংসা ও

পারস্পরিক বিভেদ লোপ পায়। গাছ-পালা, পশু-পাখি সবার প্রতি হৃদয়ে ভালোবাসা জন্মে। এতে বিশ্বজগতের কল্যাণ হয়।

পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি: প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকে। জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ ঈশ্বর। পরমেশ্বর নিরাকার হলেও ভক্তের কাছে তিনি সাকার রূপে আবির্ভূত হন। ভগবানের প্রতি ভক্তের যে ভালোবাসা তাই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের ভাষায়, 'পত্র, পুষ্প, ফল, জলসহ যে ভক্ত কামনাশূন্য হয়ে ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করে আমি তাঁর উপহার গ্রহণ করি'। (গীতা, ৯/২৬) অতএব, ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে লাভ করে পরম প্রশান্তি পাওয়া যায়।

- আমরা গীতা অনুসারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের যেসব বৈশিষ্ট্য নিজের ভেতরে খুঁজে পাই তা প্রত্যেকে 'আমার বৈশিষ্ট্য' ছকে লিখি।

ছক ১.৯: আমার বৈশিষ্ট্য

সত্ত্ব	রজঃ	তমঃ

- আমরা গীতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জেনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে উপদেশগুলো পেয়েছি, তার মধ্য থেকে নিজের পছন্দের তিনটি উপদেশ 'গীতামৃত' ছকে লিখে রাখি।

ছক ১.১০: গীতামৃত

১.
২.
৩.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একখানি অমূল্যগ্রন্থ। হিন্দুধর্মানুসারী মানুষের কাছে এর বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কারণ গীতায় কর্ম ও জ্ঞানের সাথে ভক্তির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ভক্তির মাধ্যমেও ভগবানকে পাওয়া যায়। সেই পথের সন্ধান গীতায় দেওয়া হয়েছে। গীতার প্রথম কথা— কর্তব্যকর্মের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করা। কিন্তু কর্ম করলে জীবকে তার ফল ভোগ করতে হয়। এই অবস্থায় কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করে কর্ম করে যাওয়াই গীতার উপদেশ। কর্মযোগের ভাষায় এ ধরনের আসক্তিশূন্য কর্মকে বলা হয় নিষ্কাম কর্ম। কিন্তু একজন অজ্ঞানীর পক্ষে নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন সম্ভব নয়। জ্ঞান জাগরিত হলে ভ্রান্তজ্ঞান বিদূরিত হয়। তখন তিনি কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে নিষ্কাম কর্ম করতে পারেন। জ্ঞানযোগের মতে, ঈশ্বরই কর্মফলের বিধাতা। তিনি অব্যয়, অক্ষয়, নিরাকার পরমব্রহ্ম, পুরুষোত্তম । প্রতিটি জীবের মধ্যে তিনি আত্মারূপে বিরাজ করেন। এই আত্মা জন্মে না, মরে না। অস্ত্র দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করা যায় না, আগুন দিয়ে পোড়ানো যায় না। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা অবিনশ্বর। এই জ্ঞান জাগরিত হলে জীবের মধ্যে অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তদর্শন থাকে না। তিনি প্রকৃত নিষ্কাম কর্মের অনুশীলনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

কিন্তু ভ্রান্তদর্শী মানুষের মনে প্রকৃত জ্ঞান জাগরিত হয় না। কী উচিত, কী অনুচিত— তা তিনি বুঝতে পারেন না। ফলে প্রকৃত সত্য নির্ধারণে ব্যর্থ মানুষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে হতাশাগ্রস্ত বা বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হতাশাগ্রস্ত অর্জুন তারই একটি প্রতীকী চরিত্র মাত্র। যুগে-যুগে, দেশে-দেশে, সমাজজীবনে, পারিবারিক জীবনে যুদ্ধ সর্বদা চলছে। এমনকি ব্যক্তির নিজের অন্তরের মধ্যেও যুদ্ধ চলমান। এই যুদ্ধ সুর-অসুর, সুন্দর-অসুন্দর, শুভ-অশুভের মধ্যে। এই অবস্থায় প্রকৃত কর্তব্য নির্ধারণের জন্য, সর্বোপরি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একজন প্রকৃত পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পথপ্রদর্শক। তিনি অর্জুনকে কর্মযোগের আলোচনার পরই জ্ঞানের কথা বলেছেন।

কর্ম ও জ্ঞানের পাশাপাশি ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব। ভগবানের প্রতি ভক্তের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকেই ভক্তি বলে। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, প্রিয়জন-প্রীতি ইত্যাদি সার্বিক ক্ষেত্রে যে ভালোবাসা তার থেকে ঘনিষ্ঠতম আন্তরিক টান হলো ভগবানের প্রতি ভক্তের ভক্তি। গীতার দর্শন অনুসারে পরমব্রহ্ম নিরাকার হলেও ভক্তের আহ্বানে তিনি সাকার রূপে আবির্ভূত হন।

ভগবানের এই সাকার রূপের প্রমাণ দিতে গিয়ে গীতার অবতারতত্ত্বের প্রসঙ্গ এসেছে। অবতার অর্থ ভগবানের মনুষ্যরূপে জন্ম নেওয়া, অবতীর্ণ হওয়া। যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে, ভগবান তখন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন তথা ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ হন। অবতার পুরুষের আবির্ভাবের বাইরে ভক্তের প্রার্থনা অনসারে যেকোনো রূপে তিনি ভক্তের কাছে ধরা দেন। গীতার বিশ্বরূপদর্শন যোগে তার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। ভক্ত অর্জুনের প্রার্থনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন। আবার সৌম্যশান্ত সখারূপেও তার কাছে ফিরে এসেছেন।

কর্ম ও জ্ঞানমার্গের উর্ধ্বে এই ভক্তিমার্গে অবস্থান। এখানে ভক্তের সার্বিক দায়িত্ব ভগবানেরই। ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(গীতা, ১৮/৬৬)

সরলার্থ: সকল ধর্মাচরণ ত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করবো। শোক করো না।

ভক্তের কাছে ভগবানের এ ধরনের প্রতিশ্রুতি ও ভক্তের সর্বোত্তম প্রাপ্তি আর কী হতে পারে!

কর্ম ও জ্ঞানযোগের পাশাপাশি ভক্তিমার্গের কথা তুলে ধরার কারণে গীতা তাই একটি অনন্য সাধারণ গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জীবনযুদ্ধে উপস্থিত মানুষ এর বাণীকে অনুসরণ করে সার্বিক সমস্যার সমাধান পেতে পারে। এই সমাধান কর্মের পথে, জ্ঞানের পথে অথবা ভক্তের ভক্তির মাধ্যমে। এই স্বাতন্ত্র্যই গীতাকে আজ হিন্দু-ধর্মানুসারীসহ সারা বিশ্বের আলোকিত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

- চলো, গীতায় দেয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশগুলোর আলোকে আমরা একটি নাটিকা রচনা করে সবাই মিলে তা উপস্থাপন করি।
- নাটিকার উপস্থাপন শেষে প্রত্যেকে নাটিকাটি থেকে জীবনে প্রয়োগ করার মতো যে বিষয় পেয়েছি তা 'জীবনোপদেশ' ছকে লিখে রাখি।

ছক ১.১০: জীবনোপদেশ

১.
২.
৩.

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

যোগাসন

আমরা এর আগের শ্রেণিগুলোতেও যোগাসন করেছি। চলো, আমরা একটা মজার খেলার মাধ্যমে যোগাসন প্রদর্শন করি।

- আমরা দল/ জোড়ায় ভাগ হয়ে প্রত্যেকে নিজের জানা একটি করে যোগাসনের নাম টুকরো কাগজে লিখি।
- লটারির মাধ্যমে দলের একজন একটি করে কাগজ তুলি।
- দলের সবাই লটারির মাধ্যমে প্রাপ্ত যোগাসনটি দলীয়ভাবে করে দেখাই। 'যোগ-পরিক্রমা' ছকে কয়েকটি যোগাসনের নাম ও উপকারিতা এককভাবে লিখে দল/ জোড়ায় উপস্থাপন করি।

ছক ২.১: যোগ-পরিক্রমা

যোগাসনের নাম	উপকারিতা

চলো, আমরা প্রত্যেকে 'উপস্থাপনা যাচাই' তালিকায় টিক চিহ্ন (√) দিয়ে অন্য দল/ জোড়ার উপস্থাপনা মূল্যায়ন করি।

ছক ২.২: উপস্থাপনা যাচাই

নাম/ দলের নাম	উপস্থাপনা	যুক্তি	বাচনভঙ্গি	উচ্চারণ	পোস্টারের নান্দনিকতা	মন্তব্য

এ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নীরবে যে যার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে চলছে। সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবী, পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তন করছে চন্দ্র। দূর আকাশের চাঁদের টানে পৃথিবীর নদীতে জোয়ার-ভাটা আসে। চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান বদলের কারণে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়। আমরাও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবিচ্ছিন্ন অংশ, একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত আছি। এই সম্পর্ককে অনুভব করার জন্য প্রয়োজন আত্মমগ্ন হওয়া। আত্মমগ্নতায় পরমব্রহ্মের উপলব্ধি আসে। এই আত্মমগ্নতা উপলব্ধি করার একটি মাধ্যম হলো যোগাসন।

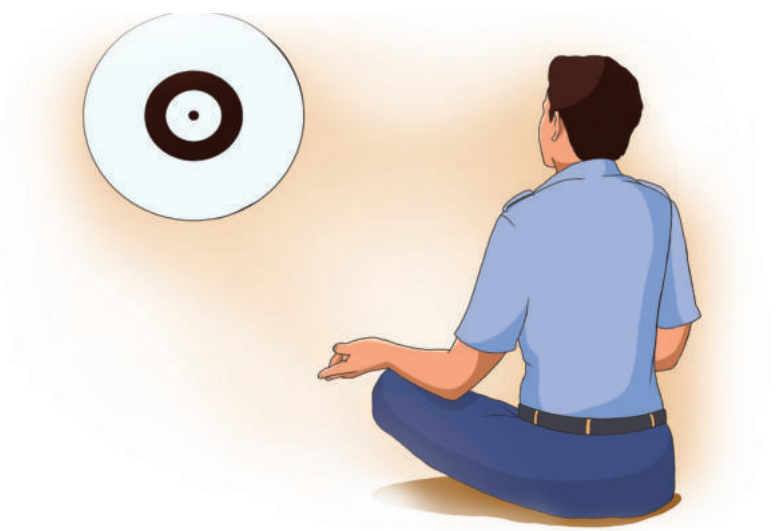

বিন্দু ব্রাটক

স্বামী পরমানন্দ বলেছেন, "বাইরে খুঁজলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না, তিনি মানুষের অন্তরে আত্মারূপে বিরাজমান, নিজের ভেতরে তাঁকে প্রকাশ করার নামই সাধনা।"

বৈদিক নিয়মে বিভিন্ন যোগাসনের মাধ্যমে আত্মমগ্ন হওয়া যায়। যোগাসন আমাদের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখে। এই যোগাসনের ধারণা বহু প্রাচীন। আমাদের

অগ্নি ত্রাটক (ত্রাটক ক্রিয়া)

ধর্মগ্রন্থগুলোতে এ সম্পর্কে বিশদভাবে লেখা হয়েছে। যোগাসন বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের অষ্টাঙ্গযোগ সম্পর্কে জানতে হবে। অষ্টাঙ্গযোগের একটি ধাপ হলো যোগাসন।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা উপরের ছবির মতো বিন্দুর দিকে তাকিয়ে এবং একইভাবে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে মনঃসংযোগ করতে পারি। এ কাজকে বিন্দু ত্রাটক ও অগ্নি ত্রাটক বলে। এতে মনে স্থিরতা আসে। সহজে আত্মমগ্ন হওয়া যায়।

চলো, আমরা শিক্ষকের সহায়তায় ধ্যান/ মেডিটেশন চর্চা করি

অষ্টাঙ্গযোগ

মহর্ষি পতঞ্জলি ১৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যোগের তত্ত্ব ও অনুশীলনের ওপর কিছু সূত্র দেন। একে যোগসূত্র বলে। যোগসূত্রে অষ্টাঙ্গযোগের কথা বলা হয়েছে। অষ্টাঙ্গযোগে আটটি ধাপ রয়েছে। নিচে ধাপগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।

১। যম: যম অর্থ সংযম। ইন্দ্রিয় এবং মনকে হিংসা, অশুভ ভাব থেকে সরিয়ে আত্মকেন্দ্রিক করা। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বস্তু ত্যাগ করা। যম পাঁচ ধরনের—

(ক) অহিংসা— সবসময় নিজের ভেতরে বিদ্বেষহীন চিন্তা ও চেতনা ধারণ করা। এককথায় মনকে ভালোবাসায় পূর্ণ রাখা। শুধু জীবের প্রতি ভালোবাসা নয়, নিখিল বিশ্বের তথা প্রতিটি বস্তুর প্রতি ভালোবাসা ।

(খ) সত্য— যেমন দেখছি, যেমন শুনছি এবং যেমন জানছি, ঠিক তেমনটাই মনে, কথায় ও কাজে প্রকাশ করাকে সত্য বলে। মানুষ যদি সত্য চিন্তা করে, যদি সত্য কথা বলে এবং সমগ্রজীবন যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

(গ) অস্তেয়— অস্তেয় অর্থ চুরি না করা। অপরের জিনিস না বলে অধিকার করাকে/নেওয়াকে স্তেয় (চুরি) বলে।

(ঘ) ব্রহ্মচর্য— ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ ও পবিত্র সংযত জীবনযাপন করা। জীবনে ব্রহ্মচর্যকে প্রতিষ্ঠা করলে দেহে শক্তি মেলে। মনে সাহস ও বুদ্ধি বিকশিত হয়।

(ঙ) অপরিগ্রহ— অপরিগ্রহ অর্থ হচ্ছে অগ্রহণ বা মুক্ত থাকা। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু সংগ্রহ করা ও মজুত করা বা ভোগের লিপ্সা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

২। নিয়ম: যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার অন্তর্গত শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের চর্চা করে আত্মশুদ্ধ হয় তা-ই নিয়ম। মহর্ষি পতঞ্জলি শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন।

(ক) শৌচ— শুদ্ধতা তথা পবিত্রতাকে শৌচ বলে। শৌচ দুই রকমের– বাইরের এবং ভেতরের। সাধকের প্রতিদিন জল দ্বারা শরীরের শুদ্ধি, সত্যাচরণ দ্বারা মনের শুদ্ধি, বিদ্যা আর তপস্যা দ্বারা আত্মার শুদ্ধি এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি প্রয়োজন।

(খ) সন্তোষ - সন্তোষ মানে সম্যক পরিতৃপ্তি। যখন যে অবস্থায় থাকা যায় সে অবস্থাকে সুখকর মনে করে আনন্দময় জীবনযাপন করা।

(গ) তপঃ - তপঃ মানে তপস্যা অর্থাৎ আত্ম-সংযম। এর মাধ্যমে দেহ, মন ও বাক্যে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা প্রদর্শন করা হয়।

(ঘ) স্বাধ্যায়– স্বাধ্যায় হচ্ছে আত্মোন্নয়নে সহায়তাকারী ও অনুপ্রেরণাদায়ী প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদি থেকে পাঠ গ্রহণ করা। কেননা শিক্ষা ও অধ্যয়নই পারে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ করে গড়ে তুলতে।

(ঙ) ঈশ্বর-প্রণিধান– প্রণিধান অর্থ অর্পণ । সমস্ত কর্ম ও ইচ্ছা ঈশ্বরে অর্পণ করার নাম ঈশ্বর-প্রণিধান।

৩। আসন— আসন অর্থ স্থির হয়ে সুখে অধিষ্ঠিত থাকা । দেহ মনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি তাই আসন।

৪। প্রাণায়াম— প্রাণায়াম অর্থ প্রাণের আয়াম। প্রাণ হলো শ্বাসরূপে গৃহীত বায়ু আর আয়াম হলো বিস্তার। সুতরাং প্রাণায়াম বলতে বোঝায় শ্বাস-প্রশ্বাসের বিস্তার। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাণায়াম সম্পন্ন হয়। শ্বাসগ্রহণকে বলে পূরক, শ্বাসত্যাগকে বলে রেচক এবং শ্বাসধারণকে বলে কুম্ভক।

৫। প্রত্যাহার— প্রত্যাহার অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া। বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে ভিতরের দিকে ফিরিয়ে

নেওয়াই প্রত্যাহার।

৬। ধারণা— মনকে বিশেষ কোনো বিষয়ে স্থির করা বা আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা। ধারণা অর্থ একাগ্রতা। নিজ দেহের অঙ্গবিশেষেও যেমন– নাভি, নাকের অগ্রভাগ বা ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থানে অথবা কোনো দেবমূর্তি বা যে-কোনো বস্তুতে মনকে নিবিষ্ট করা যেতে পারে।

৭। ধ্যান বা মেডিটেশন— ধ্যান অর্থ নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তা। নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করলে মন একসময় ঈশ্বরময় হয়ে ওঠে। ধ্যানে যোগীর দেহ শ্বাস-প্রশ্বাস ইন্দ্রিয় মন বিচারশক্তি অহংকার সবকিছু ঈশ্বরে লীন হয়ে যায়। তিনি এমন এক সচেতন অতীন্দ্রিয় অবস্থায় চলে যান যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তখন পরম আনন্দ ছাড়া তাঁর আর কোনো অনুভূতি হয় না। তিনি তাঁর আপন অন্তরের আলো দেখতে পান ।

৮। সমাধি— সমাধি অর্থ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্ত তথা হৃদয় সমর্পণ। এই সমপর্ণের মাধ্যমে মনঃশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, অহংশূন্য নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। তখন তাঁর 'আমি' বা 'আমার' জ্ঞান থাকে না। কারণ তখন তাঁর দেহ, মন ও বুদ্ধি স্তব্দ থাকে। সাধক তখন প্রকৃত যোগ লাভ করেন ।

জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার পরম আনন্দময় মিলনই সমাধি অবস্থা। সমাধি দুই প্রকার– সবিকল্প এবং নির্বিকল্প। সাধকের ধ্যানের বস্তু ও নিজের মধ্যে পার্থক্যের অনুভূতি থাকলে, তা হলো সবিকল্প সমাধি। আর সাধক যখন ধ্যানের বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান সে অবস্থাই হলো নির্বিকল্প সমাধি। এই সমাধি লাভ যোগসাধনার সর্বোচ্চ স্তর, যোগীর পরম প্রাপ্তি। চলো, আমরা অষ্টাঙ্গযোগ যেভাবে আমাদের জন্য কল্যাণকর তা 'প্রাণবায়ু' বেলুনে পাঁচটি পয়েন্টে লিখি।

'প্রাণবায়ু' বেলুন

যোগাসন

একটি বিশেষ ভঙ্গিতে মনঃসংযোগ করে কিছু সময়ের জন্য স্থির ভাবে অবস্থান করাকে যোগাসন বলা হয়। আমাদের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে যোগাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে যোগাসনকে মূলত দুটিভাগে ভাগ করা হয়। ধ্যানাসন ও স্বাস্থ্যাসন। যোগশাস্ত্রে প্রতিটি আসনেরই নাম রয়েছে। এই নামের সঙ্গে আসন যুক্ত করে উচ্চারণ করা হয়। যেমন– 'শব' নামের আসনটিকে উল্লেখ করা হয়েছে শবাসন (শব+আসন) নামে। এখন আমরা অতি পরিচিত কয়েকটি যোগাসন সম্পর্কে জানব।

সুখাসন

সুখাসন

সুখ শব্দের সাধারণ অর্থ হলো— হর্ষ, আনন্দ, প্রীতি, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি, তৃপ্তি ইত্যাদি। সুখ পাওয়া যায় এমন ভাবগত অর্থ থেকে এই আসনের নামকরণ করা হয়েছে সুখাসন (সুখ + আসন)।

পদ্ধতি

১. কোনো সমতল স্থানে, মেরুদণ্ড সোজা করে, দুই পা ছড়িয়ে বসতে হবে।

২. এবার ডান পা ভাঁজ করে বাম উরুর দিকে নিয়ে আসতে হবে।

৩. বাম পা ভাঁজ করে ভাঁজ করা ডান পায়ের নিচ থেকে বাম উরুর কাছে আনতে হবে।

৪. এবার ডান হাত ডান হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম হাঁটুর উপরে রাখতে হবে।

৫. হাতের তালু থাকবে হাঁটুর দিকে ফেরানো এবং আঙুলগুলো হাঁটুর উপর ছড়ানো থাকবে।

৬. শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এক মিনিট অবস্থান করতে হবে।

৭. তারপর পা বদল করে একই প্রক্রিয়ায় আসনটি করতে হবে।

৬. সর্বশেষে আসন ত্যাগ করে শবাসনে এক মিনিট বিশ্রাম নিতে হবে।

পুরো আসনটি মোট তিন বার করতে হবে।

উপকারিতা

১। মনের একাগ্রতা, মনঃসংযোগ ও মনের স্থিরতা বৃদ্ধি পায়।
২। ধ্যান ও প্রাণায়ামে এ আসন খুবই উপযোগী। মনের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে মনকে নিবিড়ভাবে এই আসন প্রশান্ত করে তোলে।
৩। মানসিক উদ্বেগ, অনিদ্রা, ক্ষুধা ও বিষণ্ণতা দূর করে।
৪। পিঠের ব্যথা উপশম ও মেরুদণ্ড সবল হয়।
৫। পেটের পেশী সবল, পরিপাকতন্ত্রের উন্নতি ও দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে।
৬। হাঁটুর নমনীয়তা বাড়ে। ফলে হাঁটু মুড়ে যাঁরা বসতে কষ্ট পান, তাঁদের অসুবিধা দূর হয়। এছাড়া হাঁটুর ব্যথা দূর হয়।
৭। পায়ের পাতা প্রসারিত হয়, পেশী শিথিল হয় এবং শারীরিক উত্তেজনা প্রশমিত হয়। মন শুদ্ধচিন্তা করার সহায়ক হয়।
৮। পায়ের পাতা, হাঁটু ও গোড়ালির নমনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় গাঁটের বাতজনিত ব্যথা দূর হয়, দীর্ঘক্ষণ হাঁটা-চলার ক্ষেত্রে পা সক্রিয় থাকে।

পশ্চিমোত্তাসন

পশ্চিমোত্তাসন

শরীরের ভঙ্গিমা পেছনের দিকে অর্থাৎ নিচু হয়ে পিছনের দিকে নুইয়ে করতে হয় বলে, এই আসনটি পশ্চিমোত্তাসন নামে পরিচিত। একে অনেকে উগ্রাসনও বলে। উগ্র শব্দের অর্থ হচ্ছে শিব। শিব সংহারকর্তা

বলে শিবের বৈশিষ্ট্যময় এই আসনটি দ্রুত আয়ত্ব করা বেশ কঠিন, তবে ধীরে ধীরে তা রপ্ত হলে খুব অনায়াসে করা যায়।

পদ্ধতি -

১। প্রথমে দুটি পা সামনের দিকে সোজা করে বসতে হবে।

২। দুই পা সোজা হলে দুহাতের আঙুলের সাহায্যে দুপায়ের দুটি বুড়ো আঙুল ধরতে হবে।

৩। পায়ের আঙুল ধরার সময়, কোমর থেকে দেহের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে নিতে হবে।

৪। শ্বাস-প্রস্বাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে হবে।

৫। এরপর আস্তে আস্তে দেহকে সামনের দিকে নুইয়ে আনতে হবে, যাতে মাথা দুহাঁটুর মাঝখানে স্পর্শ করে।

৬। প্রথম অবস্থায় পুরোপুরি স্পর্শ না হলে অভ্যাসের মাধ্যমে ধাপে ধাপে তা আয়ত্তে আনা যায়।

৭। পেটকে আসনরত অবস্থায় ভেতর দিকে সঙ্কুচিত করতে হবে, ফলে খুব সহজেই সামনের দিকে নুইয়ে পড়তে কষ্ট হবে না।

৮। মাথা হাঁটু স্পর্শ করলে, মাথা দুটি হাতের মাঝখানে থাকবে।

৯। প্রথম দিকে এই আসন শুধুমাত্র ৫ সেকেন্ড করাই উত্তম। তারপর আবার সোজা হয়ে বসতে হবে। এভাবে বারবার অভ্যাস করতে হবে।

১০। প্রথমদিকে প্রতিদিন চার বার এবং ৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত অভ্যাস করাই বিধেয়। এই আসন ভালোভাবে রপ্ত হলে ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে দিতে হবে।

উপকারিতা-

১। দেহের গ্রন্থিগুলি নমনীয়, সবল ও সতেজ হয়। কোমরের ব্যথাবেদনার উপশম হয়।

২। মূত্রাশয়, উদর, পিত্তাশয় প্রভৃতি বেশ সক্রিয় ও সবল হয়ে ওঠে।

৩। দেহ শক্তিশালী, সুঠাম ও লাবণ্যময় হয়ে ওঠে।

৪। অন্ত্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণের গতি বাড়ে। ফলে খাদ্যবস্তু দ্রুত শরীরের একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর ঘটে।

৫। পেটে অনাকাঙ্ক্ষি চর্বি কমে আসে।

৬। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ঠিক থাকে ও পরিপাকক্রিয়া সঠিকভাবে চলে।

৭। মন ও চিন্তা-চেতনা ঊর্ধ্বমুখী হয়।

৮। হেচকী তথা ঊর্ধশ্বাসজনিত কোনো রোগ থাকলে তা সহজেই নিরাময় হয়।

৯। যাঁদের বেশিক্ষণ হাঁটতে পায়ে কষ্ট হয়, এ আসনের ফলে পায়ের পেশী ও স্নায়ুগুলো খুব সবল ও সতেজ হয়ে ওঠে। দীর্ঘক্ষণ হাঁটলেও ক্লান্তি আসে না। পায়ের বাত নিরাময় হয়।

১০। এ আসনে খুব সহজেই শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি আসে। মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে এ আসন নিয়মিত অভ্যাসে ভালো সুফল দেয়।

১১। মেরুদণ্ড, পেট, হৃদপিণ্ডের যথাযথ ব্যায়াম হয়। ফলে পেটে বাড়তি মেদ জমতে পারে না। মেরুদণ্ড সংকোচন-প্রসারণে নমনীয় হয় ও হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়।

১২। পেটে অসুখ হলে তা দ্রুত সারিয়ে তুলতে এ আসন অতি উত্তম।

১৩। বহুমূত্র রোগ নিরাময় করে।

১৪। মনোবল বৃদ্ধি করে ও শরীরের স্নায়ুবিক দুর্বলতা কমায়।

ভুজঙ্গাসন

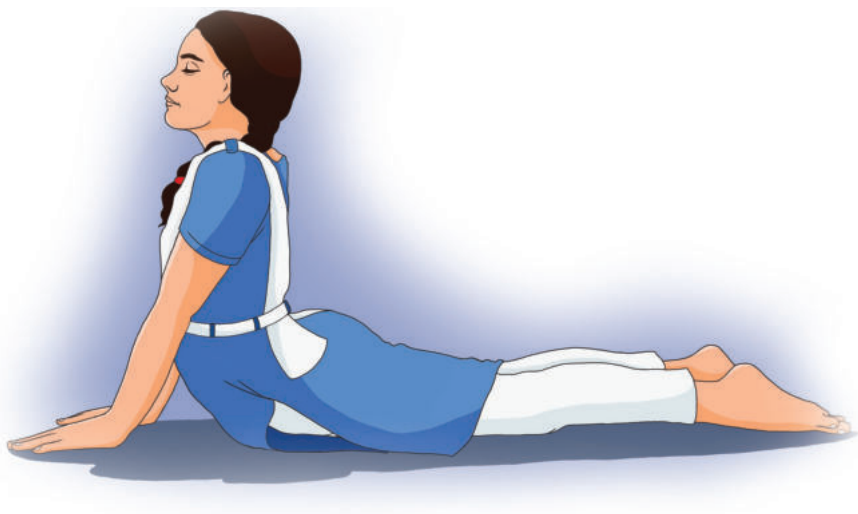

ভুজঙ্গাসন

ভুজঙ্গ অর্থ সাপ। এই আসনের দেহভঙ্গিমা সাপের মতো দেখায় বলে এর নামকরণ করা হয়েছে ভুজঙ্গাসন (ভুজঙ্গ +আসন)।

পদ্ধতি

১. সমতল স্থানে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। পায়ের দুই পাতা ও গোড়ালি জোড়া থাকবে।
২. দুই হাত কনুই থেকে ভাঁজ করে বুকের দুই পাশে স্থাপন করতে হবে।
৩. হাতের তালু মাটির দিকে ফেরানো থাকবে।
৪. দুই হাতে ভর দিয়ে মাথাসহ শরীরের উর্ধ্বাংশ ধীরে ধীরে উপরে তুলতে হবে।
৫. এবার হাত ও পেটের উপর ভর দিয়ে শরীরকে ঊর্ধ্বমুখী করে ত্রিশ সেকেন্ড অবস্থান করতে হবে। এই সময় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।
৬. ত্রিশ সেকেন্ড পর আসন ত্যাগ করে, শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

আসনটি মোট তিন বার করতে হবে।

উপকারিতা

১. মেরুদন্ডের নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়। মেরুদন্ডের বাত দূর হয়।

২. কোমরের বাত ও ব্যথার উপশম হয়।

৩. পিঠ ও কোমরের পেশি মজবুত হয়।

৪. মেয়েদের ঋতুস্রাবের ব্যথা ও অনিয়ম দূর হয়।

৫. যকৃৎ, প্লীহার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৬. অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্যের উপশম হয়।

৭. উচ্চ-রক্তচাপের রোগীদের জন্য এই আসন অত্যন্ত সুফল প্রদান করে থাকে।

- চলো, আমরা প্রত্যেকে 'যোগ-অমৃত' তালিকায় দেওয়া যোগাসনগুলোর পদ্ধতি এবং উপকারিতা বিশ্লেষণ করে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখি।

ছক ২.৩: যোগ-অমৃত

	সুখাসন	**পশ্চিমোত্তাসন**	**ভুজঙ্গাসন**
১	বসে করতে হয়		উপুড় হয়ে করতে হয়
২		পেটে অনাকাঙ্ক্ষি চর্বি কমে আসে	
৩			
৪			
৫			

- যোগাসনের মাধ্যমে আমরা যা-কিছু অর্জন করতে পারি তা 'ধ্যানমান আত্ম-উপলব্ধি' ছকটির উপযুক্ত ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে প্রত্যেকে প্রকাশ করি।

ছক ২.৪: ধ্যানমান আত্ম-উপলব্ধি

ক্রম	নিবিড় পর্যবেক্ষণের বিষয়	সবসময় ৫	অধিকাংশ সময় ৪	মাঝে মধ্যে ৩	কখনো কখনো ২	কখনোই না ১
১.	ভোরের নীরবতা পর্যবেক্ষণ					
২.	সুরের তালে হারিয়ে যাওয়া					
৩.	গান/ প্রার্থনায় নিমগ্নতা					
৪.	ভালো স্বপ্নে বিভোর থাকা					
৫.	সকলের আনন্দের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া					
৬.	কঠিন সময়কে সহজ করার আকাঙ্ক্ষা					
৭.	আপন শক্তিতে জেগে ওঠা					
৮.	নদী/ সাগর/ ঝর্ণার কলতানে একাত্ম হওয়া					
৯.	অদম্য লক্ষ					
১০.	গভীর চিন্তা করার অবিরাম প্রচেষ্টা					
১১.	বাড়ি, পাড়া, মহল্লা, প্রতিবেশী ও সমাজের জন্য কিছু করার মানসিকতা					
১২.	কঠিন পরিস্থিতিতে সহজ হওয়ার সক্ষমতা					
১৩.	যে-কোনো পরিস্থিতিতে হাসিমুখে কথা বলা					
১৪.	দেখার বাইরে চিন্তা করা					
১৫.	সবাইকে সুখী করার অদম্য প্রচেষ্টা					
১৬.	নিজের মাঝে অনাবিল আনন্দের সন্ধান লাভ					
প্রাপ্ত মান:						
আমার অর্জন:						
নিজের/ দলনেতার মতামত ও স্বাক্ষর:						
শিক্ষকের মন্তব্য ও স্বাক্ষর:						

নির্দেশক (মোট মান ৮০)

৭১-৮০ পরিপূর্ণ জীবন	৬১-৭০ জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা	৫১-৬০ সম্ভাবনাময় জীবন	৩৫-৪৯ সফলতার সূত্রপাত	০-৩৪ জেগে ওঠার প্রচেষ্টা

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-অঞ্চল নির্বিশেষে সারা বিশ্বেই মানুষ এখন শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য যোগ ব্যায়াম বা ইয়োগা করছে। তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ইয়োগা সেন্টার, ইয়োগা ক্লাব ইত্যাদি। ইয়োগা ক্যাম্পেরও আয়োজন করা হয়। এমনকি ২১ জুনকে ঘোষণা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক ইয়োগা ডে বা যোগ দিবস হিসেবে।

তোমরাও একটি 'ইয়োগা ক্লাব' গঠনের উদ্যোগ নাও। আর সুবিধাজনক একটি দিনে বিদ্যালয়ে 'ইয়োগা ডে' পালন করো। সেদিন ইয়োগা ক্যাম্পেরও আয়োজন করবে। সুস্থতা, স্থিরতা ও মনঃসংযোগের মাধ্যমে 'নিজের মাঝে এক সুন্দর পৃথিবী গড়ি/ সৃষ্টিজগতের কল্যাণ করি' এই স্লোগান নিয়ে কাজ করে যাও।

- চলো, শ্রেণির সবাই মিলে আলোচনা করে 'ইয়োগা ক্লাব গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর তালিকা' তৈরির কাজ করি। সবার মতামত মিলিয়ে প্রত্যেকে নিচের ছকে লিখে রাখি।

তালিকা ২.৫: ইয়োগা ক্লাব গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর তালিকা

- ইয়োগা ডে'তে কী কী করা যায় তা নিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করে 'ইয়োগা ডে কর্মসূচি' ছকে তার পরিকল্পনা লিখি। তারপর দলগত আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করি।

ছক ২.৬: ইয়োগা ডে কার্যক্রম

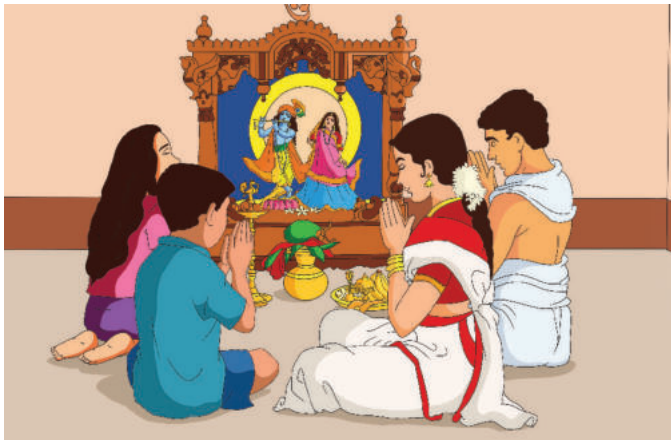

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মাচার ও পূজা-অর্চনা

আমরা অনেকেই হয়তো পাঁচালি পড়েছি বা শুনেছি। পাঁচালি হলো এক ধরনের লোকজ গীতিকথা। আমাদের হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে পাঁচালি আছে। এই পাঁচালিগুলোতে মূলত সেইসব দেবদেবীর কাহিনি, উপাখ্যান, মহিমা, স্তুতি, প্রার্থনা ইত্যাদি বিভিন্ন ছন্দে বর্ণিত থাকে। যা সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর পূজার সময়ে সুর করে পাঠ করা হয়। চলো, মনসার পাঁচালির কিছু অংশ সুর করে পড়ি।

১	২	৩
শিবকন্যা মনসা দেবী লভিলা জনম।	দেবীরে সনকা ডাকে পরম সাদরে।	পুত্রের সুযোগ্য পাত্রী চাঁদ করি মনে।
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা শশীকলা সম॥	মনসার পূজা করে নানা উপচারে॥	বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে বেহুলার সনে॥
একদা মনসা দেবী বাসুকীরে কয়।	এ খবর পেয়ে চাঁদ হয়ে রোষায়িত।	শুভক্ষণে শুভলগ্নে পুত্রের বিবাহ।
কাহার নন্দিনী আমি দেও পরিচয়॥	হেতালের গদা হাতে তথা উপনীত॥	মহাসমারোহে চাঁদ করিল সম্পন্ন॥
তখন ধ্যানেতে সব জানি পঞ্চানন।	চাঁদের আচার হেরি রুষ্ট হয়ে বিষহরি	বাসরে পুত্রের মৃত্যু সর্পের দংশনে।
সাজিতে কন্যারে লয়ে করিল গমন॥	সর্পগণে আদেশ করিল॥	সে কথা চাঁদের মনে জাগে সর্বক্ষণে॥
কৈলাসে লইয়া গেল দেব শূলপাণি।	পাইয়া আদেশ তার ক্রমে ছয় পুত্র তার।	চাঁদের অজ্ঞাতে ছিল ছিদ্র লৌহ ঘরে।
তথায় দেখিয়া তারে হরের গৃহিণী॥	দংশনেতে যম ঘর দিল॥	ছিদ্র আসি কালীনাগ দংশে লখিন্দরে॥
পতির যুবতী ভার্যা করিয়া চিন্তন।	তখন সনকা সতী পঞ্চমাস গর্ভবতী।	শ্বশুর চরণে পড়ি বেহুলা তখন॥
বাম চক্ষু নষ্ট তার করিল তখন॥	বাণিজ্যেতে গেল পতি দুঃখে দিন কাটায় অতি	কাঁদিয়া বলিল মোর শুন নিবেদন।
পিতা শিব মনসারে লইয়া তখন।		ভেলায় পতিরে লয়ে করিব গমন॥
সিজুয়া পর্বতে তিনি করেন গমন॥		সুরলোকে যেয়ে আমি শিবের প্রাসাদে।
		অবশ্য জিয়াব মোর পতি নির্বিবাদে॥

বিশ্বকর্মা দ্বারা সেথা গড়ি দিব্য ঘর।	দশমাস দশদিনে শুভলগ্ন শুভক্ষণে।	আর যদি কোনক্রমে না কর স্বীকার।
মনসা দেবীরে তথা স্থাপিলেন হর।।	পাড়া পড়শি সংবাদ পেয়ে সত্বর আসিল ধেয়ে।	অনশনে ত্যাজিব এ জীবন আমার॥
অনেক চিন্তিয়া তবে দেব শূলপাণি।	পুত্র দেখি সবে হয় খুশি॥	আজ্ঞা দিল চাঁদবেনে না দেখে উপায়।
কপালের ঘর্ম মুছে হস্তেতে তখনি॥	রূপে অতি মনোহর সর্বচিত্ত মুগ্ধকর।	বধূসহ লখিন্দরে মান্দাসে ভাসায়॥
এক কন্যা তাতে করে জনম ধারণ।	ভূতলে আসিল যেন শশী॥	গুরুজন পদ বন্দি বেহুলা সুন্দরী।
মনসার সখীরূপে রহে সর্বক্ষণ॥	হোথা চাঁদ সদাগরে মনসার কোঁপে পড়ে।	দেবীর প্রসাদে চলি যায় সুরপুরী॥
অতঃপর মনসা দেবী ভাবিলেন সার।	জলে ডুবে তার সপ্ততরী॥	দেবের সভায় নৃত্য করিয়া বেহুলা।
চম্পক নগরে হবে পূজার প্রচার॥	তীরে উঠে অতি কষ্ট করি॥	সর্বদেবগণে তথা সন্তুষ্ট করিলা॥
জগাই জেলে আর নিছনীর ঘরে॥	অতিশয় দীন বেশে বেড়াইয়া দেশে দেশে।	বেহুলা প্রতিজ্ঞা করে দেবের সভায়।
ফিরিল কপাল তাদের মনসার বরে।	কোনোক্রমে আসি নিজ ঘর॥	মনসার পূজা করাইবে শ্বশুর দ্বারায়॥
সেই গ্রামে বাস করে চাঁদ সদাগর।	তনয়ের মুখ দেখি হইল পরম সুখী।	তুষ্ট হয়ে জিয়াইল দেবী লখিন্দরে।
সনকার স্বামী সদা পূজেন শঙ্কর॥	নাম তার রাখে লখিন্দর॥	আরও এনে দিল মৃত ছয়টি ভাসুরে॥
মনসার প্রভাব যখন সনকা শুনিল।	দিনে দিনে শশীসম বাড়ে পুত্র নিরুপম।	বেহুলা শ্বশুর পদে করিল মিনতি।
মনসা পূজিতে মনে ভক্তি উপজিল॥	অধিকারী হল সর্বগুণ॥	তুষ্ট হয়ে চাঁদে করে মনসার স্তুতি॥

- চলো, আমরা মনসার পাঁচালিতে কোন দেবী সম্পর্কে বলা হয়েছে আর তাঁর সম্পর্কে কী কী বলা হয়েছে তা দলে/জোড়ায় আলোচনা করে প্রত্যেকে ‘দেবী-কথন’ ছকে পয়েন্ট আকারে লিখি।

ছক ২.৬: দেবী-কথন’ ছক

এবারে চলো, আমরা কিছু ছবি দেখি।

১

২

৩

৪

৫

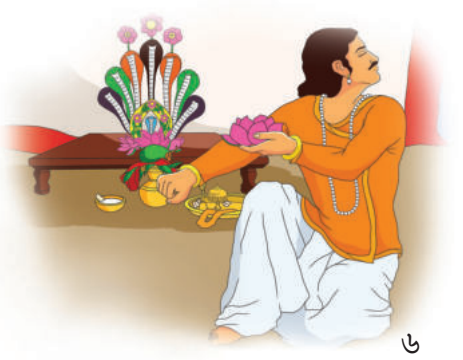

৬

- আমরা যে ছবিগুলো দেখলাম, সেগুলো সম্পর্কে ভাবি। এ বিষয়ে নিচে কিছু কথা লেখা আছে। লেখাটি পড়ি।

বাংলার সাহিত্য-নাটক-সিনেমা-গানে আমরা বেহুলা-লখিন্দরের কথা অনেক শুনেছি। প্রায় সাতশ বছর আগে এই কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছিল মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্য। এই কাহিনিতে আমরা দেখি, দেবী মনসা পৃথিবীতে নিজের পূজা প্রচলনের জন্য চাঁদ সওদাগরকে কতভাবেই না অনুরোধ করেছেন। চাঁদ সওদাগরের সব নৌকা ডুবিয়ে তাকে নিঃস্ব করেছেন। একে একে ছয় ছেলেকে মেরে ফেলেছেন। তবুও চাঁদ সওদাগরের কাছ থেকে পূজা আদায় করতে পারেননি মনসা দেবী। এরপর চাঁদ সওদাগরের ছোট ছেলে লখিন্দরও বিয়ের রাতে মনসার পাঠানো সাপের কামড়ে মারা যায়। কিন্তু স্ত্রী বেহুলা বহু বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করে স্বর্গে গিয়ে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনে। এই কাহিনিই মনসার পাঁচালিতে বর্ণনা করা হয়েছে। মনসাপূজায় এই পাঁচালি পাঠ করা হয়।

- আমরা মনসার পাঁচালি, ছবি এবং গল্পটির মধ্যে যে যোগসূত্র খুঁজে পেলাম তা নিয়ে দল/ জোড়ায় আলোচনা করে এককভাবে একটি গল্প লিখি এবং গল্পের নাম দেই। কাজ শেষে সকলের সামনে উপস্থাপন করি।

ছক ২.৭: মনসার গল্প

যে গল্পটি লেখা হয়েছে তাতে মনসা দেবীর কাহিনি ফুটে উঠেছে। এই যে আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পাঁচালি পড়ি, পূজা-অর্চনা করি এগুলো আমাদের ধর্মাচারের অংশ। এবারে তাহলে আমরা ধর্মাচার সম্পর্কে জেনে নেই।

ধর্মাচার: ধর্মাচার হলো ধর্মীয় রীতি ও নীতির অন্তর্গত কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকর্ম। আবার ধর্মানুষ্ঠানের সময় যেসব রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাও ধর্মাচার। ধর্মাচারকে অনেক সময় লোকাচারও বলা হয়। মানুষের বিশ্বাস অনুসারে অঞ্চলভেদে রীতিনীতির পার্থক্যের কারণে ধর্মাচার লোকাচারে পরিণত হয়। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুসারে সংক্রান্তি উৎসব, গৃহপ্রবেশ, জামাইষষ্ঠী, রাখিবন্ধন, হাতেখড়ি প্রভৃতি হচ্ছে ধর্মাচার।

দেবদেবী: হিন্দুধর্মে দুভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা হয় । নিরাকার ও সাকার রূপে। পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান। প্রকৃতির গাছপালা জীবজন্তু আকাশ-বাতাস সবকিছুর মধ্যে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে পরমেশ্বরের রূপ কোনো আকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই তিনি নিরাকার। নিরাকার হলেও ভক্তের আহ্বানে পরমেশ্বর বিশেষ উদ্দেশ্য, বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ কাজের জন্য সাকার রূপে ভক্তের কাছে আবির্ভূত হন। তখন তিনি সুনির্দিষ্ট রূপ, সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতার অধিকারী হন। পরমেশ্বরের সেই সাকার রূপকে বলা হয় দেবদেবী। যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, শীতলা, শনি প্রমুখ।

পূজা-অর্চনা: ধর্মীয় রীতিনীতিকে অনুসরণ করে যেসব অনুষ্ঠানাদি করা তাই ধর্মানুষ্ঠান। পূজা হলো একটি ধর্মানুষ্ঠান। পূজা শব্দের অর্থ ভক্তি নিবেদন করা; শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বা সম্মান জানানো। পূজা হিন্দুধর্মের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের নিরাকার ও সাকার উভয় রূপের উপাসনার বিধান আছে। দেবদেবীর মূর্তি বা প্রতিমা হলো ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের রূপকল্প বা প্রতীক। স্থান ও কালভেদে বিভিন্ন প্রকার পূজানুষ্ঠান প্রচলিত আছে। যেমন: গৃহে বা মন্দিরে নিত্যপূজা, আবার বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা করা হয়, যেমন: দুর্গাপূজা। কোনো শুভ কাজের শুরুতে বা সফলতা লাভের উদ্দেশ্যেও আরাধ্য দেবদেবীর পূজা করা হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় বিধিবিধান মেনে আরাধ্য দেবদেবীর পূজা করা হয়। শাস্ত্রমতে আসনশুদ্ধি, সংকল্প, বিঘ্ন অপসারণ, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞ, আরতি, অঞ্জলি, বিসর্জন প্রভৃতি পূজার অঙ্গ। আবার গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পাদ্য, অর্ঘ্য ইত্যাদি বাহ্য-উপচারে দেবদেবীর পূজা করা হয়। মনের ভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ব্যাকুলতা, একাগ্রতা ইত্যাদি অন্তঃ-উপচারের সাথে পূজা করলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয়। পূজা সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।

(গীতা, ৯/২৬)

সরলার্থ: যে ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল ভক্তিসহকারে আমাকে উৎসর্গ করে, শুদ্ধচিত্ত সেই ভক্তের ভক্তিপূর্ণ উপহার আমি সানন্দে গ্রহণ করি।

নিচে মনসাপূজা ও শনিপূজার বিবরণ দেওয়া হলো:

মনসা দেবীর পরিচয়

মনসা সাপের দেবী। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে মনসাপূজা হয়। মনসাপূজার সঙ্গে মানুষের জীবন -জীবিকার সম্পর্ক রয়েছে। একসময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক স্থানের মানুষ জলাশয়ের ধারে, নদীর পাড়ে, জঙ্গালের মধ্যে বসবাস করত। এসব স্থানে প্রচুর সাপের বাস ছিল। এ কারণে মানুষ সাপের দংশন থেকে রক্ষা পেতে মনসা দেবীর পূজা করত।

মনসা মূলত লৌকিক দেবী। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে তাঁর পূজা করে। মানুষের মাধ্যমে লৌকিক সমাজে মনসাপূজার প্রসার ঘটেছে। পরবর্তীকালে সৃষ্ট কিছু পুরাণে মনসা দেবীর উদ্ভব ও প্রসারের কথা বলা হয়েছে। এভাবে লৌকিক থেকে তিনি পৌরাণিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন।

মনসা দেবী

মনসা দেবীকে বিষহরী, মহাজ্ঞানযুক্তা ও সিদ্ধিদাত্রী বলা হয়। সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞান থেকে উচ্চতর জ্ঞান হলো মহাজ্ঞান। মহাজ্ঞান জাগরিত হলে মনের হিংসা, বিদ্বেষ, নিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি নষ্ট হয়। হিংসা-বিদ্বেষ মনকে বিষময় করে। সাপের বিষের যন্ত্রণা থেকেও যা তীব্রতর। মহাজ্ঞান সেই বিষকে বিনষ্ট করে। মনসাপূজার মাধ্যমে মানুষের মনে মহাজ্ঞান জাগরিত হয়। মানুষের মনের বিদ্বেষ-বিষ নষ্ট হয়। মন আনন্দে ভরে ওঠে। সে কারণে তিনি বিষহরী। আবার মহাজ্ঞানী ধাপে ধাপে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হন। দেবী মনসাকে পূজার মাধ্যমে সেই সিদ্ধি লাভ হয়, তাই তিনি সিদ্ধিদাত্রী।

মনসা দেবীর প্রতিমা

মনসা দেবীর চার হাত। নিচের বাম হাতে সাপ। নিচের ডান হাতে অভয়মুদ্রা। প্রতিটি হাতে রয়েছে অতি বিষধর সাপের কঙ্কণ। দেবীর মাথায় সাতটি সাপের একটি মুকুট। প্রতিটি সাপের মাথায় রয়েছে মণি। সাদা চাঁপা ফুলের মতো তাঁর গায়ের রং। তাঁর পরনে উদীয়মান সূর্যের মতো লাল রঙের কাপড়। মনসাকে ঘিরে আছে আটটি সাপ— অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ। তাঁর বাহন হাঁস। চন্দ্রবদনা দেবী হাঁসের

উপর বসে থাকেন। তাঁর পায়ের নিচে রয়েছে পদ্মের আসন।

মনসা দেবীর পূজাপদ্ধতি

মনসাপূজা করা হয় দুভাবে— ঘট অথবা প্রতিমা স্থাপন করে। এই পূজার জন্য বিশেষ ঘট তৈরি করা হয়। ঘটে সর্পমূর্তি থাকে। বিধি মেনে সেখানে মনসার পূজা করা হয়। এ কারণে অঞ্চলভেদে মনসাপূজার অপর নাম ঘটপূজা। পূজার আঙ্গিনায় সিজ গাছ লাগানো হয়। সিজ গাছ হলো মনসা পূজার জন্য বিশেষ গাছ, যা ফণীমনসা গাছ নামেও পরিচিত। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মনসা দেবীর পূজা হয়। এই তিথিকে বলা হয় নাগপঞ্চমী। আবার শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতেও এই পূজার বিধান রয়েছে। পূজা শেষে মনসা দেবীর পাঁচালি পাঠ করা হয়।

পারিবারিক আঙ্গিনা, একক মন্দির বা সর্বজনীন মন্দিরে মনসাপূজা করার নিয়ম প্রচলিত।

মনসা দেবীর প্রণামমন্ত্র

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।

জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসা দেবী নমোঽস্তু তে।।

সরলার্থ: আস্তিক মুনির মাতা, বাসুকি নাগের ভগিনী, জরৎকারু মুনির পত্নী মনসা দেবী, তোমাকে নমস্কার।

মনসাপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

মনসাকে সাপের দেবী হিসেবে পূজা করা হয়। এতে মানুষের মনে সাপের ভীতি দূর হয়। জল-জঙ্গলপূর্ণ ভূখণ্ডে জীবন-জীবিকার জন্য রাতবিরাতে মানুষকে নানা কাজে বের হতে হয়। সেসময়ে মনসার পূজারীর মনে সাপের ভীতির পরিবর্তে সাহস বা আস্থা বিরাজ করে। ফলে সাপ দেখে ভক্ত ভয় পায় না।

সাপ একটি প্রাকৃতিক প্রাণী। তার ওপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করলে প্রকৃতির প্রতি মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা প্রকাশ পায়। মানুষ সাপকে হত্যা না করে তাকে রক্ষা করে। সাপরক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পায়। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সাপের ভীতি দূর করা, সাপকে বাঁচানো, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার পাশাপাশি প্রকৃত জ্ঞান লাভ ও মনের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করাই মনসাপূজার উদ্দেশ্য।

মনসাপূজার কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য আমরা প্রত্যেকে ‘মনসা-স্তুতি রহস্য’ ছকে লিখি।

ছক ২.৮: মনসা-স্তুতি রহস্য

শনিদেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

শনিদেবের পরিচয়

হিন্দুধর্মে একজন দেবতা শনি। নবগ্রহের মধ্যে অন্যতম গ্রহ শনির নাম অনুসারে তাঁর নামকরণ। ব্যক্তিগত জীবনের নানা বাধাবিপত্তি দূর করা এবং পৃথিবীর কল্যাণের জন্য শনিপূজা করা হয়।

সূর্য ও বিশ্বকর্মার কন্যা ছায়ার পুত্র শনি। তিনি পৌরাণিক দেবতা। তাঁর চার হাত। হাতে ধীর-ধনুক ও দন্ড। অসদাচারীকে শাস্তিপ্রদানের প্রতীক এই দন্ড। তাঁর গায়ের রং নীল। পরিধেয় বস্ত্র কালো। কালো রঙের মেঘ

শনিদেবের ছবি

পুঞ্জীভূত হয়ে অঞ্জনের (কাজলের) মতো দেখায়। এ কারণে তাঁকে 'নীল-অঞ্জন-চয়-প্রখ্য' বলা হয়। তাঁর গতি অত্যন্ত ধীর, শনিগ্রহের মতো। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘুরে আসতে সময় লাগে এক বছর। সেখানে শনিগ্রহের সময় লাগে ঊনত্রিশ বছর। ধীরগতির জন্য তাই শনিদেবকে 'শনৈশ্চর' বলা হয়। 'শনৈঃ' শব্দের অর্থ ধীরে ধীরে।

শনিদেবের পূজাপদ্ধতি

প্রতি শনিবার গৃহের আঙ্গিনায় শনিদেবের পূজার বিধান রয়েছে। সর্বজনীন শনিমন্দিরেও শনিপূজা করা যায়।

পূজার জন্য লৌহ-আসন, লৌহ-পাত্র, লৌহ-ঘট দরকার হয়। বিকল্পে কালো কাপড়ে মোড়া আসন, কালো রঙের পাত্র এবং কালো রঙের ঘট ব্যবহার করার বিধান রয়েছে। এছাড়া কালো তিল, কালো বা নীল রঙের ফুল, কালো শাড়ি বা কালো পাড়যুক্ত শাড়ি মুখ্য উপচার। এছাড়া ঋতুভিত্তিক পাঁচ প্রকারের ফল, পাঁচ প্রকারের শস্য, ধূপ-দীপ, পান-সুপারি, আটা, গুড়, বাতাসা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। পূজা শেষে শনিদেবতার পাঁচালি পাঠ করা হয়। পাঁচালি পাঠ শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আমরা প্রত্যেকে শনিদেবের পূজার উপচার-সংশ্লিষ্ট নিচের 'চেনা উপচার' ছকটি পূরণ করি।

ছক ২.৯: চেনা উপচার

শনিদেবের পূজায় যেসব উপচার তুমি দেখেছ	শনিদেবের পূজায় যেসব উপচার তুমি সহজে সংগ্রহ করতে পারো

শনিদেবের প্রণামমন্ত্র

নীলাঞ্জন-চয়-প্রখ্যং রবিসূত-মহাগ্রহম্।

ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং ত্বং নমামি শনৈশ্চরম্।।

সরলার্থ: নীল অঞ্জনের ন্যায় রং, ছায়ার গর্ভজাত সূর্যদেবের পুত্র শনিদেবতাকে নমস্কার।

শনিদেবের পাঁচালি

শনিদেবের পাঁচালি পাঠ করার আগে গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রমুখ দেবতাদের স্মরণ করতে হয়। এরপর শনিদেবতাকে স্মরণ করে পাঁচালি পাঠ শুরু করতে হয়।

ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

শ্রীহরি নামেতে এক ছিল দ্বিজবর।

করিতে ব্রাহ্মণ সেবা ছিল মন তাঁর ।।

নিত্য ভিক্ষা করি করে উদর পূরণ।

তাহাতে দ্বিজ সেবা হয় অনুক্ষণ ।।

বিনা চিন্তামণি চিন্তা অন্য চিন্তা নাই।

কেমনে সে চিন্তামণি চিনিবারে পাই ।।

(সংক্ষেপিত)

শনিপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ না হলে মনে এক ধরনের অতৃপ্তি ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় অনেক সময় মানুষ বিপথগামী হয়। অন্যায় কাজে যুক্ত হয়। শনিদেবতা সেই অন্যায়কারীকে শাস্তি দেন। শনিদেবতার শাস্তির ভয়ে মানুষ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে। এভাবে ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজ সুন্দর হয়।

পৃথিবীর ওপর সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোর প্রভাব রয়েছে। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে, বর্ণে গন্ধে স্বাদে পরিপূর্ণ হয়। শনিগ্রহের প্রভাবও তার ব্যতিক্রম নয়। শনিগ্রহের কুপ্রভাবে পৃথিবীতে এক ধরনের বিরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আবার সুপ্রভাবে পৃথিবী ফল-ফসলে পরিপূর্ণ হয়। প্রাকৃতিক গ্রহের দেবমূর্তিই শনিদেবতা। শনিদেবতার শুভ প্রভাবে ব্যক্তিগত এবং সার্বিক অমঙ্গল দূর হয়। এ কারণে ব্যক্তি ও সমাজের পাশাপাশি সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল সাধনের জন্য আমরা শনিদেবতার পূজা করে থাকি।

- আমরা প্রত্যেকে 'শনিদেবের প্রভাব' ছক পূরণ করে শনিদেবের পূজা সম্পর্কে মতামত দেই।

ছক ২.১০: শনিদেবের প্রভাব

'শনিদেবের পূজা করলে জগতের যে সকল কল্যাণ হয়' তা নিজের জীবনের আলোকে লিখি —
১. ২. ৩.

- মনসাপূজা, শনিপূজাসহ সকল পূজায় আবশ্যকীয় উপকরণ ঘট। আগের শ্রেণিগুলোতেও আমরা বিভিন্ন পূজার ঘট সম্পর্কে জেনেছি। এবারে প্রত্যেকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী যে-কোনো একটি পূজার ঘট তৈরি করি। তারপর পূজার ঘট এবং সেই পূজার কল্যাণকর দিক সম্পর্কে নিচের 'কল্যাণ-ঘট' ছকটি পূরণ করি।

ছক ২.১১: কল্যাণ-ঘট

যে পূজার ঘট বানিয়েছি	সেই পূজার কল্যাণকর দিক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তীর্থক্ষেত্র

আমরা অনেকেই বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের নাম শুনেছি যেমন- গয়া, কাশি, বৃন্দাবন, ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে অনেকে আবার এসব তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণও করেছে। তবে মজার ব্যাপার হলো, এসকল স্থান কীভাবে তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তা আমরা অনেকেই জানিনা। তীর্থক্ষেত্রগুলো সর্ম্পকে অনেক পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত আছে। আজ আমরা এরকমই একটি গল্প পড়ব।

সতীদেবীর জন্ম ও দক্ষযজ্ঞের কাহিনি

পুরাকালে দক্ষ নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ব্রহ্মার বরে তিনি প্রজাপতিদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষমতা পান। একবার তিনি দেবী মহামায়াকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে এই বর চান যে, মহামায়া যেন তাঁর ঘরে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের এই প্রার্থনা পূরণ করতে মহামায়া সম্মত হন। কিন্তু তিনি একটি শর্তও জুড়ে দেন— দক্ষ তাঁর প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ করলে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। অতঃপর রাজা দক্ষ এবং রানি প্রসূতির ঘরে সতীর জন্ম হয়। তাঁদের ষোলোটি কন্যা ছিল। তাঁদের মধ্যে সতীদেবী ছিলেন দেবী মহামায়ার মনুষ্যরূপ। পরবর্তীতে মহাদেবের সাথে সতীদেবীর বিবাহ হয়। এদিকে জামাতা শিব দক্ষরাজকে মোটেই সম্মান করতেন না।

একবার দেবতারা এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন। দক্ষ সেখানে এলে উপস্থিত প্রজাপতিরা দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানান। কিন্তু শিব দাঁড়ালেন না। জামাতা শিবের আচরণে দক্ষ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। ক্ষুব্ধ দক্ষ বাড়ি ফিরে বৃহস্পতি-যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেখানে দক্ষের কন্যারা স্বামীসহ নিমন্ত্রিত ছিলেন। কেবল সতী আর শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। পিতার এই বৈষম্যমূলক আচরণে সতী রুষ্ট হয়ে একাই বিনা নিমন্ত্রণে পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। দাম্ভিক দক্ষ তখন সতীকে অপমান করেন। সতীর সামনেই শিবের নিন্দা করতে থাকেন। স্বামী-নিন্দা শুনে সতী যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। জানতে পেরে মহাদেব শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। শোকে, ক্ষোভে তিনি নিজের মাথার জটা ছিন্ন করে ভূমিতে ফেলে দেন। ছিন্নজটা থেকে বীরভদ্ররূপে শিবের একটি উগ্ররুপের উদ্ভব হয়। শিবের অনু-চরদের সঙ্গে নিয়ে বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দেন। বীরভদ্রের অস্ত্রের আঘাতে দক্ষের মাথা কাটা পড়ে। তারপর শিব যজ্ঞস্থলে এসে সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয় নৃত্য শুরু করেন। নৃত্যের তাণ্ডবে পৃথিবী রসাতলে যায় যায় অবস্থা! এ অবস্থা থেকে রক্ষা করতে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে শিবের কাঁধে থাকা সতীর দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে থাকেন। সতীর দেহ একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত হয়। খণ্ডগুলো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পতিত হয়। যেসব জায়গায় সতীর দেহখণ্ড পড়েছে সেই জায়গাগুলোকে বলা হয়, শক্তিপীঠ বা মহাপীঠ।

সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শিবের তাণ্ডবনৃত্য

- এই গল্পটির আলোকে বইপত্র, সাক্ষাৎকার, ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করে দলে/ জোড়ায় তথ্য সংগ্রহ করে প্রধান প্রধান শক্তিপীঠ ও তাদের অবস্থান সম্পর্কিত 'শক্তিপীঠের অবস্থান' তালিকাটি তৈরি করি।

ছক ২.১২: শক্তিপীঠের অবস্থান

প্রধান প্রধান শক্তিপীঠ	অবস্থান

- মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার ইত্যাদি যে-কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে দলে/ জোড়ায় তালিকাটি উপস্থাপন করি।

এই যে আমরা প্রধান প্রধান শক্তিপীঠগুলোর তালিকা করলাম, এসব জায়গা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে তীর্থস্থান। কারণ এখানে সতীদেবীর ছিন্ন শরীরের অংশ পড়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্মস্থান, মন্দির, আশ্রম, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি কারণে একটি স্থান তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। এই তীর্থস্থানগুলোকে ধর্মস্থানও বলে। ধর্মস্থানগুলো ধর্মীয় দিক থেকে পবিত্রস্থান। ধর্মচর্চার স্থান। হিন্দুধর্মে অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

তাঁদের এবং তাঁদের ধর্মমতকে কেন্দ্র করে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ভক্তরা পুণ্য অর্জনের জন্য, ধর্মচর্চার জন্য সেখানে আসেন। হিন্দুধর্মের নানা উৎসবের পাশাপাশি মহাপুরুষের জীবনকেন্দ্রিক নানা উৎসবও সেখানে পালিত হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে সেখানে গড়ে উঠেছে আবাসনসহ বিভিন্ন অবকাঠামো। সবকিছু মিলে এসব স্থানকে বলা হয় ধর্মস্থান।

আবার হিন্দুধর্মের পৌরাণিক কাহিনির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো পবিত্রস্থান বা তীর্থক্ষেত্রে মন্দিরসহ নানা স্থাপনা গড়ে উঠেছে। সেখানেও ধর্মচর্চা হয়। নানারকমের উৎসব হয়। দর্শনার্থী ও ভক্তদের সমাগম ঘটে। এ সকল স্থানকেও ধর্মস্থান বলা হয়।

ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের নানা ধর্মস্থান আছে। বাংলাদেশেও বেশকিছু রয়েছে — পাবনায় সৎসঙ্গ, হরিচাঁদ ঠাকুরের ওড়াকান্দিধাম, সিলেটের চৈতন্যদেবের আদি পিতৃভুমি, সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথধাম, রাজশাহীতে ক্ষেতুড়িধাম, নারায়ণগঞ্জে লাঙ্গলবন্ধ, লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বারদীধাম ইত্যাদি। এখানে আমরা জানব, দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক কাহিনি-ভিত্তিক বাংলাদেশের ছয়টি শক্তিপীঠ এবং ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ চারটি ধাম, যা চতুর্ধাম নামে প্রসিদ্ধ।

বাংলাদেশের ছয়টি শক্তিপীঠ।

সতীর দেহখণ্ড পতিত হয়ে তৈরি হয়েছিল একান্নটি শক্তিপীঠ। এর মধ্যে ছয়টির অবস্থান বাংলাদেশে। এই পীঠস্থানগুলোর নাম— সুগন্ধা, ভবানী, জয়ন্তী, মহালক্ষ্মী, অপর্ণা ও যশোরেশ্বরী।

সুগন্ধা শক্তিপীঠ

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর গ্রামে সুগন্ধা নদীর পশ্চিম পাড়ে সুগন্ধা শক্তিপীঠের অবস্থান। সতী দেবীর নাসিকা এখানে পড়েছিল। নাসিকা যেহেতু গন্ধ নেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাই এই পীঠের নাম দেওয়া হয় সুগন্ধা। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে—

সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা।
ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা।।

নদীর অন্য পাড়ে আছে শিবের ভৈরব অবতার ‘ত্র্যম্বক’ এর মন্দির।

সুগন্ধা শক্তিপীঠ

জনশ্রুতি অনুযায়ী এই মন্দির প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। এখানে পুরোনো মন্দিরের জায়গায় নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে। পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট নতুন মন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়ার নিচে মূল গর্ভগৃহে দেবী সুগন্ধা রয়েছেন। স্থানীয়ভাবে দেবী এখানে ‘উগ্রতারা’ নামে পূজিতা।

এখানে দেবীর নিত্যপূজা হয়। আবার প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সুগন্ধাপীঠের সবচেয়ে বড় উৎসব শিবচতুর্দশী। তখন মহাধুমধামে শিবপূজা হয়। দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থী এখানে আসেন।

বরিশাল শহরের নথুল্লাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসযোগে ইসলাবী যেতে হয়। সেখান থেকে রিকশা-ভ্যানে সহজেই সুগন্ধা শক্তিপীঠে যাওয়া যায়।

ভবানী শক্তিপীঠ

ভবানী শক্তিপীঠ

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর রয়েছে ভবানী শক্তিপীঠ। সীতাকুন্ড বাজার থেকে প্রায় চার কিলোমিটার পূর্বে চন্দ্রনাথ পাহাড়। এর চূড়ায় ভবানী শক্তিপীঠের অবস্থান। স্থানীয়দের কাছে যা চন্দ্রনাথ শক্তিপীঠ নামে পরিচিত। এখানে দক্ষকন্যা সতীর ডান হাত পড়েছিল। ভবানী শক্তিপীঠের পাশে শিবের ভৈরব অবতার 'চন্দ্রশেখর' নামে পূজিত। অন্নদামঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে—

চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অর্ধ অনুভব। ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব ।।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সৌন্দর্য অতি মনোরম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু এই পাহাড়। চারিদিকে পাহাড়ি বন। পাহাড়ের পশ্চিম দিকে বিশাল সমুদ্র। বিশ্রাম নিয়ে ধাপে ধাপে পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে হয়। ভবানী শক্তিপীঠ ছাড়াও এখানে চন্দ্রনাথ শিবের মন্দির, মহাপুরুষকেন্দ্রিক নানা মন্দির, ধর্মশালা ইত্যাদি রয়েছে।

দেশবিদেশ থেকে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থী এখানে আসেন। পাপমোচন বা মনকে পবিত্র করার জন্য ভক্তদের আগমন ঘটে। এখানে দেবীর নিত্যপূজা হয়। ভবানী শক্তিপীঠের সবচেয়ে বড় উৎসব শিবচতুর্দশী। উৎসব উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। চট্টগ্রাম শহরের অলঙ্কার মোড় বা কদমতলীর মোড় থেকে ঢাকা-চট্টগ্রামগামী বাসে সীতাকুন্ড বাসস্টপেজ পৌঁছানো যায়। সেখান থেকে টেম্পু বা অটোরিকশাযোগে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে যাওয়া যায়। দীর্ঘসিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের শীর্ষে পৌঁছোলে দেবীর পীঠস্থানের দর্শন মেলে।

জয়ন্তী শক্তিপীঠ

জয়ন্তী শক্তিপীঠ

সিলেট জেলার কানাইঘাট থানার কালাজোড় বাউরভাগ গ্রামে জয়ন্তী শক্তিপীঠের অবস্থান। এখানে সতীদেবীর বাম উরু পড়েছিল। জয়ন্তী শক্তিপীঠের পাশেই শিবের অবতার ভৈরব ক্রমদীশ্বর নামে পূজিত। অন্নদামঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে—

জয়ন্তায় বাম জঙ্ঘা ফেলিলা কেশব। জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীশ্বর ভৈরব।।

এই পীঠে একটি চারকোণা অগভীর গর্তে

একটি পাথরখন্ড আছে। পাথরখন্ডটির আকৃতিও চারকোণা। লোকশ্রুতি আছে, এ পাথরখন্ডটি সতীর বাম উরুর রূপান্তরিত রূপ। ভক্তদের বিশ্বাস, দেবী ও ভৈরব ক্রমদীশ্বর একই কূপে একই সাথে বিরাজ করেন। জনৈক জমিদার এ পাথরের অলৌকিকত্ব জানতে পেরে এখানে মন্দির নির্মাণ করেন। পাশে অন্য একটি অগভীর কূপ আছে। যার জল অতি স্বচ্ছ। সেই জলেই দেবীর পূজা হয়।

পীঠস্থানকে কেন্দ্র করে এখানে নাটমন্দির, শিবমন্দির, সানবাঁধানো দীঘি নির্মিত হয়েছে। প্রতিবছর চৈত্র মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে এখানে মায়ের পূজা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থী তখন এখানে আসেন।

জয়ন্তীপীঠে যেতে হলে সিলেট থেকে বাসযোগে প্রথমে চতুলবাজার, চতুলবাজার থেকে অটোরিকশাযোগে শলৈঘাট হয়ে কালাজোড় বাউরভাগে যেতে হবে। এখানেই দেবীর দর্শন পাওয়া যায়।

মহালক্ষ্মী শক্তিপীঠ

মহালক্ষ্মী শক্তিপীঠ

সিলেট জেলার আর একটি শক্তিপীঠের নাম মহালক্ষ্মী। সিলেট শহরের তিন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে দক্ষিণ সুরমায়, সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ মহাসড়কের পশ্চিম পাশে জৈনপুর গ্রামে এই পীঠের অবস্থান। এখানে সতী দেবীর গ্রীবা (গলা) পতিত হয়। তাই একে গ্রীবা-মহাপীঠও বলা হয়। দেবীর গ্রীবা পড়েছিল একটি শৈলখন্ডের উপর। সেই শৈলখন্ডই দেবীরূপে পূজিত। মহাদেব ভৈরব এখানে সর্বানন্দ নামে পূজিত। অন্নদামঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে—

শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।

সর্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি।।

পুরাতন মন্দিরের পরিবর্তে এখানে নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে। যা অত্যন্ত কারুকার্য-খচিত, প্রশস্ত ও দৃষ্টিনন্দন। এখানে নবরাত্রি উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। তখন দেশ-বিদেশ থেকে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে।

সিলেট শহরের কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল থেকে মোগলাবাজার রোড ধরে রিকশা, ভ্যান বা অটোরিকশায় তিন কিলোমিটার গেলেই মহালক্ষ্মী শক্তিপীঠে পৌঁছোনো যায়।

অপর্ণা শক্তিপীঠ

অপর্ণা শক্তিপীঠ

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে অপর্ণা শক্তিপীঠের অবস্থান। দেবীর বাম পায়ের গোঁড়ালি বা বাম কান এখানে পড়েছিল। মহাদেবের অবতার ভৈরব এখানে বামন নামে পূজিত। অন্নদামঙ্গলে বলা হয়েছে —

করতোয়া তটে পড়ে বাম কর্ণ তাঁর।
বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার ।।

এই পীঠস্থানে অনেকগুলো পুকুর রয়েছে। যার মধ্যে বিখ্যাত শাঁখারী-পুকুর। নাটোরের মহারানি ভবানীকে এই পুকুরের মধ্যে শাঁখা-পরিহিতা অবস্থায় দেবী দেখা দিয়েছিলেন, এমন লোকশ্রুতি রয়েছে। ভক্তরা তাই পাপমোচনের জন্য এই পুকুরের জলে স্নান করেন। শিবমন্দির, নাটমন্দির, গোপালমন্দির, ভোজনশালা— সব মিলে পীঠস্থানটি গড়ে উঠেছে। দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, রামনবমী, মাঘীপূর্ণিমা ইত্যাদি উৎসব সাড়ম্বরে এখানে পালিত হয়। দূরদূরান্ত থেকে পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীরা তখন এখানে আসেন।

বগুড়া থেকে বাসযোগে শেরপুর এবং শেরপুর থেকে রিকশা বা ভ্যানে করে সহজেই অপর্ণা শক্তিপীঠে পৌঁছানো যায়।

যশোরেশ্বরী শক্তিপীঠ

যশোরেশ্বরী শক্তিপীঠ

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর গ্রামে যশোরেশ্বরী শক্তিপীঠ অবস্থিত। যশোরেশ্বরী অর্থ যশোরের ঈশ্বরী। অর্থাৎ যশোরের দেবী। এখানে দেবীর হাতের তালু ও পায়ের পাতা পতিত হয়। মহাদেব শিবের অবতার ভৈরব চণ্ড নামে এখানে পূজিত। এখানকার পীঠের মূল মন্দির, শিবমন্দির, পুকুর সবই ত্রিকোণাকৃতি। এই পীঠস্থানে নিত্যপূজা হয়। সবচেয়ে বড় উৎসব শ্যামাপূজা। পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। দূরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা উৎসবে যোগ দেন। মন্দিরের পাশে মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতির অবস্থান সর্বজনীনতা প্রমাণ করে।

সাতক্ষীরার কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল থেকে বাসযোগে শ্যামনগর এসে রিকশা-ভ্যানে করে যশোরেশ্বরী শক্তিপীঠে পৌঁছানো যায়।

- এই ছয়টি শক্তিপীঠের নাম ও প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে এককভাবে ‘শক্তিপীঠের বৈশিষ্ট্য’ ছকে লিখি।

ছক ২.১৩: শক্তিপীঠের বৈশিষ্ট্য

ক্রম	শক্তিপীঠ	বৈশিষ্ট্য

- বাংলাদেশের মানচিত্রে ছয়টি শক্তিপীঠের অবস্থান চিহ্নিত করে ‘মানচিত্রে শক্তিপীঠ’ কাজটি করি।

মানচিত্রে শক্তিপীঠ

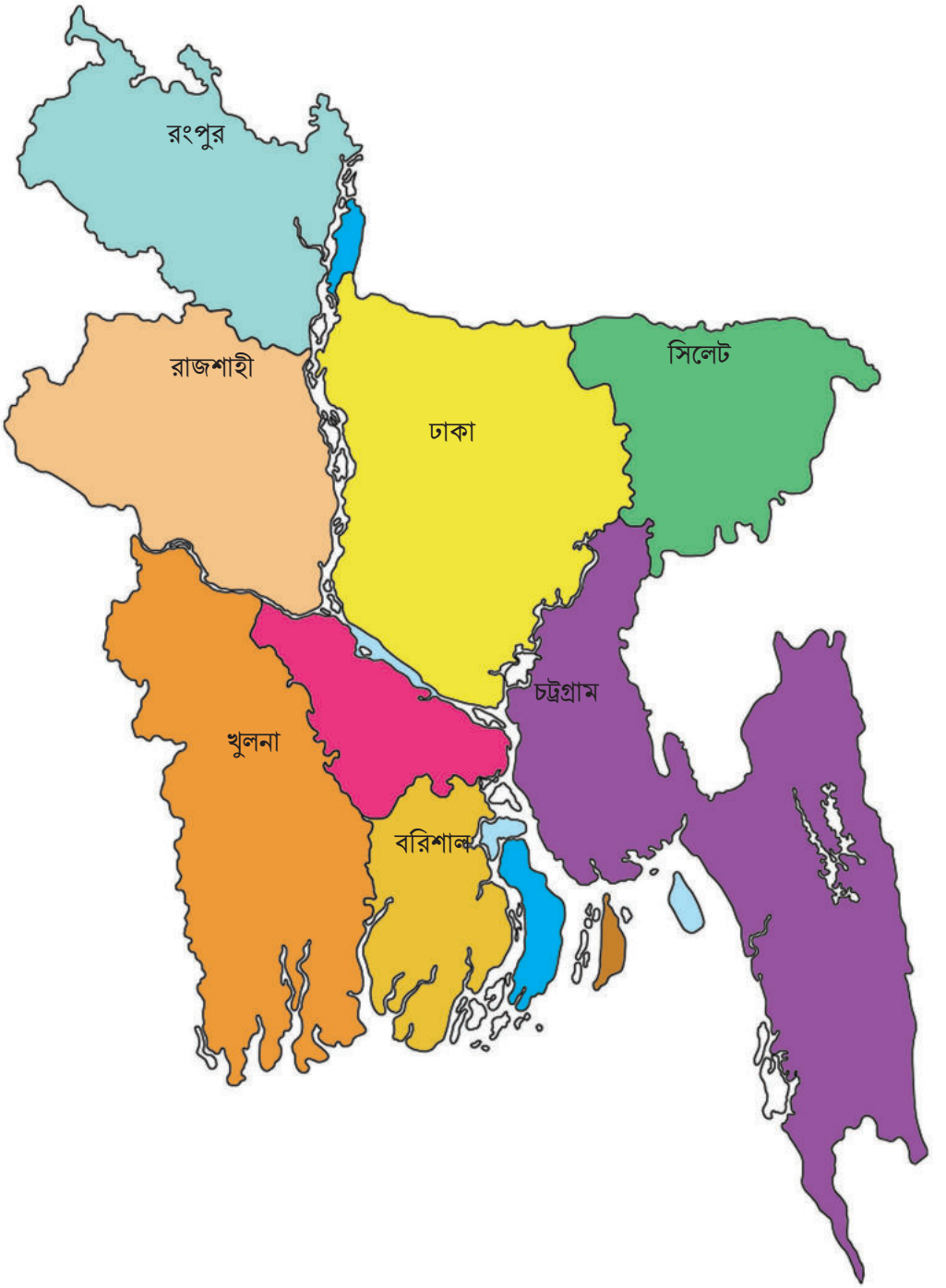

চতুর্ধাম

'ধাম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিবাস, আশ্রয়স্থল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে দেবতার অধিষ্ঠিত নিবাসস্থলই ধাম। অলৌকিক ধর্মীয় কাহিনি বা মহাপুরুষদের জীবন-লীলার সাথে যুক্ত পুণ্যভূমিকেও ধাম বলা হয়। ভক্তরা নিজের পাপমোচন, পুণ্য অর্জন, সর্বোপরি নির্মল প্রশান্তি লাভের জন্য ধামে আসেন। ধামে এসে সংসারে আবদ্ধ জীবের মনের নানা জটিলতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যায়। ধামগুলোকে তাই পুণ্যভূমি, তীর্থক্ষেত্র বা মোক্ষভূমিও বলা হয়। ধামের মূল দেবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মন্দির। আবার, আগত ভক্তদের সুবিধার্থে সেখানে আবাসন, রন্ধনশালা, ভোজনালয়, ধর্মশালা ইত্যাদির ব্যবস্থাও থাকে। এ সব প্রতিষ্ঠানকে একসাথে ধাম বলা হয়।

হিন্দুধর্মে অনেক ধামের উল্লেখ আছে। ধামগুলোর মধ্যে চারটি ধাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— বদ্রীনাথধাম, রামেশ্বরমধাম, দ্বারকাধাম এবং জগন্নাথধাম। এদেরকে একসাথে চতুর্ধাম বলা হয়। ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চার প্রান্তসীমায় চারটি ধামের অবস্থান। ভারতের মানচিত্রকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থের দিক থেকে সমান দুই ভাগ করে একটি গাণিতিক যোগ-চিহ্ন (+) আঁকা হলে চিহ্নের বাহুগুলোর শীর্ষপ্রান্তে ধামগুলোর অবস্থান। বদ্রীনাথধাম ভারতের উত্তর সীমানায়, রামেশ্বরমধাম দক্ষিণ সীমানায়, দ্বারকাধাম পশ্চিম সীমানায় এবং জগন্নাথধাম পূর্ব সীমানায় অবস্থিত। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে বদ্রীনাথধাম সত্যযুগের, রামেশ্বরমধাম ত্রেতাযুগের, দ্বারকাধাম দ্বাপরযুগের এবং জগন্নাথধাম কলি যুগের কাহিনির সাথে যুক্ত। তীর্থক্ষেত্রের পাশাপাশি ধামগুলো দর্শনীয় স্থান হিসেবেও মনোরম।

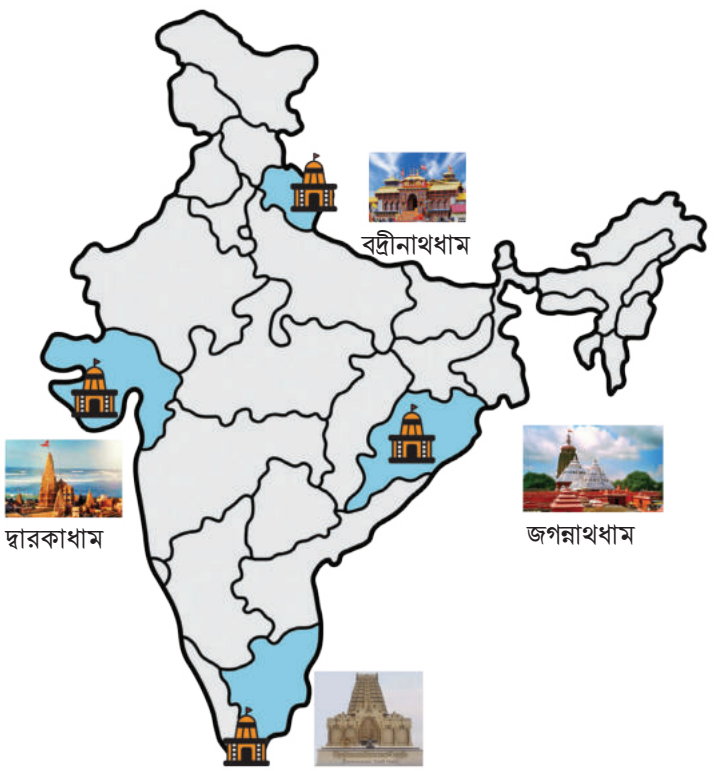

ভারতের চার প্রান্তে অবস্থিত চারটি ধাম

বদ্রীনাথধাম

বদ্রীনাথধাম

ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের চামোলি জেলার একটি শহর বদ্রীনাথ। শহরের গাড়োয়াল পার্বত্য এলাকায় অলকানন্দা নদীর ধারে বদ্রীনাথধাম অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার মিটার উচ্চতায় এই ধামের অবস্থান। ভগবান বিষ্ণু এখানে বদ্রীনারায়ণ-রূপে পূজিত। স্থানীয়রা এই ধামকে 'দীব্যদেশম' বলেন। তাঁদের বিশ্বাস ভগবান বিষ্ণু এখানে জাগ্রত অবস্থায় রয়েছেন।

দীর্ঘ সিঁড়ি অতিক্রম করে মূল মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরটি তিন ভাগে বিভক্ত— সভামণ্ডপ, দর্শনমণ্ডপ ও গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে চাঁদোয়ার নিচে বদ্রীনায়ায়ণের চতুর্ভুজ মূর্তি স্থাপিত। কষ্টিপাথরের এই মূর্তির উচ্চতা এক মিটার। উপরের দুই হাত উত্তোলিত অবস্থায় শঙ্খ ও চক্র ধারণ করা। নিচের দুই হাত যোগমুদ্রায় ও পদ্মাসনে স্থিত।

মন্দিরের একদিকে নরপর্বত এবং বিপরীত দিকে নারায়ণ-পর্বত। মন্দিরে রয়েছে তপ্তকুণ্ড নামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। ভক্তদের বিশ্বাস কুণ্ডের জলে স্নান করলে রোগমুক্তি হয়। পাহাড়ি পরিবেশ, বহমান অলকানন্দা নদী— সব মিলে বদ্রীনাথধামের পরিবেশ অতি মনোরম। রাতের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে তা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

লোকশ্রুতি অনুসারে, শঙ্করাচার্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অলকানন্দা নদী থেকে বদ্রীনাথের মূর্তি উদ্ধার করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে বদ্রীনাথধামে ভক্তদের সমাগম বাড়তে থাকে। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, বদ্রীনাথধামের প্রকৃত নাম বদরিকা-ধাম বা বদরিকাশ্রম। সংস্কৃতে 'বদর' শব্দের অর্থ কোলিবৃক্ষ বা কুল গাছ। ভগবান বিষ্ণু হিমালয়ের এই তীব্র শীতাঞ্চলে ধ্যানমগ্ন হন। তাঁকে শীত থেকে রক্ষার জন্য লক্ষ্মীদেবী বদরবৃক্ষ-রূপে ছায়া দিতে থাকেন। সহধর্মিণীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান নারায়ণ এই স্থানের নাম দেন বদরিকাশ্রম। পরে তা বদ্রীনাথধামে পরিচিত হয়।

এখানে গঙ্গামাতার আবির্ভাব উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। হিমালয় থেকে দেবী গঙ্গার পৃথিবীতে আবির্ভাবকে উপলক্ষ করে এই উৎসব ।

ভারতের কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে রেলযোগে উত্তরাখণ্ডের হৃষিকেশে যাওয়া যায়। সেখান থেকে গণ-পরিবহনে বদ্রীনাথধামে পৌঁছে বদ্রীনারায়ণের বিগ্রহ দর্শন করা যায়। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী বিগ্রহ দর্শনে আসেন। উল্লেখ্য, বদ্রীনাথধাম বছরে ছয় মাস (এপ্রিলের শেষ থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত) দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। তীব্র শীতের বিরূপ আবহাওয়ার জন্য বাকি ছয় মাস বন্ধ থাকে।

রামেশ্বরমধাম

ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের রামনাথপুর জেলার পামবান দ্বীপে রামেশ্বরমধামের অবস্থান। ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে পামবান দ্বীপ সেতুর মাধ্যমে যুক্ত। দক্ষিণ ভারতের এই দ্বীপ থেকে শ্রীলঙ্কা মাত্র চল্লিশ কি-

লোমিটার দূরে অবস্থিত। দ্বীপের একদিকে বঙ্গোপসাগর, অন্যদিকে ভারত মহাসাগর। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ পূজিত হন, যা জ্যোতির্লিঙ্গ নামে পরিচিত। এখানে রামেশ্বরম-এর পাশাপাশি রামেশ্বরী অর্থাৎ দেবী পার্বতী পূজিতা। মন্দিরে রয়েছে বাইশটি কূপ, যাকে কুণ্ড বলা হয়। প্রতিটি কুণ্ডের জলের তাপমাত্রাসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আলাদা। ভক্তদের বিশ্বাস, কুণ্ডের জলে স্নান করলে আরোগ্য লাভ হয়।

রামেশ্বরমধাম

রামেশ্বরম একটি সমস বদ্ধ শব্দ যিনি রাম তিনিই ঈশ্বর= রামেশ্বরম। অতএব রামের নামেই এই ধামের নামকরণ। রামায়ণ অনুসারে লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্তৃক অপহৃতা স্ত্রী সীতাকে উদ্ধারের আগে রামচন্দ্র বানর সৈন্যদের সাথে নিয়ে এই দ্বীপে জড়ো হন। সীতাকে উদ্ধার শেষে পুনরায় একই স্থানে একত্রিত হন। সেখানে রাবণকে বধের প্রায়শ্চিত্ত করতে শিবলিঙ্গের পূজা করা হয়। সেই লিঙ্গই প্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিঙ্গ। এখানে নিত্যপূজা ছাড়াও নানা উৎসবাদি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে সরাসরি রামেশ্বরধামে যাওয়ার ট্রেন পাওয়া যায়।

দ্বারকাধাম

ভারতের গুজরাট রাজ্যের দ্বারকা জেলায় অবস্থিত দ্বারকাধাম। দ্বারকা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শহরগুলোর মধ্যে একটি। দ্বারকা শব্দটি এসেছে দ্বার থেকে। দ্বার অর্থ দরজা। বহু দ্বারের সমন্বয়ে দ্বারকা নগরী সুরক্ষিত হতো। তাই নগরীর নাম দ্বারকা। গোমতী নদী ও আরব সাগরের সঙ্গমস্থলেই দ্বারকামন্দির। এখানে দ্বারকাধীশ নামে ভগবান নারায়ণ পূজিত। শঙ্করাচার্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সমুদ্রের জলে বহুবার নিমজ্জিত হয় দ্বারকামন্দির। পরে তা পুনর্নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে সংস্কারকৃত সেই মন্দির দৃশ্যমান।

দ্বারকাধাম

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে দ্বারকার রাজা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। রাজা হিসেবে তাঁকে দ্বারকাধীশ বলা হয়। তিনি সমুদ্র থেকে বারো

যোজন (৯৬ বর্গ কি.মি.) জায়গা জলশাসনের মাধ্যমে উদ্ধার করে এই নগরী নির্মাণ করেছিলেন।

কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে রেলযোগে আহমেদাবাদ গিয়ে, আহমেদাবাদ থেকে রেলপথে দ্বারকা ধামে পৌঁছানো যায়।

জগন্নাথধাম

ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের পুরী জেলায় জগন্নাথধাম অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরের তীরে অত্যন্ত নান্দনিক পরিবেশে এর অবস্থান। জগন্নাথ শব্দের অর্থ জগতের নাথ। ভগবান নারায়ণকেই এখানে জগন্নাথ বলা হয়েছে। জগন্নাথদেবের মন্দিরকে কেন্দ্র করে এখানে জগন্নাথধাম গড়ে উঠেছে।

জগন্নাথধাম

মন্দিরের প্রাচীরের চারটি দ্বার— সিংহদ্বার, হস্তীদ্বার, অশ্বদ্বার ও ব্যাঘ্রদ্বার। মূল মন্দিরে ওঠার জন্য রয়েছে সুদীর্ঘ সিঁড়ি।

জগন্নাথদেবের বিগ্রহ নির্মাণের একটি পৌরাণিক কাহিনি রয়েছে। কৃষ্ণভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর উপাসনা করতে চান। কিন্তু কোন মূর্তিতে ভজনা করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। এমন সময় ইন্দ্রদ্যুম্নের সামনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নকে পুরীর সমুদ্রতটে ভেসে আসা একখণ্ড কাঠ দিয়ে বিগ্রহ নির্মাণের আদেশ দেন। এ সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদ্যুম্নের সামনে উপস্থিত হন। তিনি কাষ্ঠখণ্ড থেকে বিগ্রহ নির্মাণের দায়িত্ব নেন। কিন্তু মূর্তি নির্মাণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কেউ কাজে বাধা দিতে পারবেন না, এই বলে তিনি নির্মাণ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। এদিকে নির্মাণ শেষ হওয়ার আগেই রাজা অস্থির হয়ে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখতে পান, মূর্তির হাত-পা তৈরি তখনও বাকি। শিল্পীও অনুপস্থিত। এই শিল্পীই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। পরে সেই অসমাপ্ত মূর্তিই জগন্নাথ নামে জগন্নাথধামে পূজিত হয়ে আসছে।

জগন্নাথদেবের পাশাপাশি এখানে কৃষ্ণভ্রাতা বলরাম এবং কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রার বিগ্রহ রয়েছে।

পুরীর জগন্নাথধামে সারা বছরে মোট বারোটি পার্বণ পালিত হয়। পার্বণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা হয়। ঐদিন জগন্নাথদেবের বিগ্রহকে বের করে রথে তোলা হয়। সাথে বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহকে রথে তোলা হয়। রথকে রশিতে বেঁধে ভক্তরা তা টেনে নিয়ে যান। সাত দিন পর রথকে টেনে মন্দিরে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। একে বলে উল্টোরথ। লক্ষ লক্ষ ভক্ত রথযাত্রায় যোগ দেন।

কলকাতার হাওড়া থেকে ট্রেনযোগে বা বাসে করে পুরীর জগন্নাথ ধামে যাওয়া যায়।

- ‘শক্তিপীঠ দর্শন’ ছকটি এককভাবে পূরণ করি।

ছক ২.১৪: শক্তিপীঠদর্শন

শক্তিপীঠগুলোয় যে কারণে ভ্রমণ করতে যাওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি–

- আমরা যেতে চাই এ রকম একটি তীর্থস্থান/ ধর্মস্থানে যাওয়ার জন্য দলে/ জোড়ায় একটি ‘ভ্রমণ-পরিকল্পনা’ তৈরি করে এককভাবে লিখি।

ছক ২.১৪: তীর্থস্থান ভ্রমণ-পরিকল্পনা

যেখানে যেতে চাই:	যে কারণে যেতে চাই:
যেভাবে যাব:	যা যা করবো:

- চলো আমরা, দলে/ জোড়ায় বড় আকারের কাগজে লিখে ভ্রমণ পরিকল্পনাটি সবার সামনে উপস্থাপন করি।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মূল্যবোধ চর্চা

- ওপরের ছবিগুলো ভালো করে দেখি। ছবিতে কী ঘটছে তা কয়েকটি শব্দে ছবির নিচের ঘরগুলোয় লিখি। ছবিতে যেরকম দেখছি, আমরাও সেরকম অনেক কাজ করি। আমরা প্রত্যেকে নিজের জীবনের

এ রকম একটি বাস্তব চিত্রের কথা ‘অপরের জন্য আমি’ শিরোনামে গল্প আকারে লিখে সবার সামনে উপস্থাপন করি।

ছক ৩.১: অপরের জন্য আমি

প্রত্যেক প্রাণী যে-রূপে জন্মগ্রহণ করে সেরূপেই বেড়ে ওঠে, সেভাবেই জীবন পার করে। হাঁসের বাচ্চা হয় হাঁস আর ঘাসের বীজ থেকে জন্মায় ঘাস। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টা অন্যরকম। ‘মানুষ’ হিসেবে পরিচয় পাওয়ার জন্য তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। এই মনুষ্যত্ব হলো কতকগুলো সদগুণের সমষ্টি। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো মূল্যবোধ। আর যে মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের বিচার করে তার আলোকে আচরণ করতে পারে তাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে। আমরা ছবিতে এরকম কিছু

নৈতিক মূল্যবোধের উদাহরণ দেখেছি। সত্যকামের গল্পে 'সত্যবাদিতা', রাম-লক্ষ্মণের গল্পে 'ভ্রাতৃপ্রেম', কর্ণের গল্পে 'গুরুজনে ভক্তি' ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধগুলোর কথা জেনেছি। মানুষের ভেতরে এ রকম আরও অনেক নৈতিক মূল্যবোধ থাকে, যেমন: উদারতা, ক্ষমাশীলতা, দায়িত্ববোধ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি।

- আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এ রকম অনেক নৈতিক মূল্যবোধ কাজ করে। আমার নিজের ভেতরে থাকা তিনটি নৈতিক মূল্যবোধের কথা লিখে 'আমার নৈতিক মূল্যবোধ' তালিকাটি সম্পূর্ণ করি।

ছক ৩.২: আমার নৈতিক মূল্যবোধ

১.
২.
৩.

- চলো, আমরা প্রত্যেকে সহপাঠীদের নৈতিক মূল্যবোধ এবং নিজের জানা আরও কিছু নৈতিক মূল্যবোধের নামের তালিকা লিখে 'আমাদের মূল্যবোধ' ছকটি পূরণ করি।

ছক ৩.৩: আমাদের মূল্যবোধ

হিন্দুধর্মেও এ রকম অনেক নৈতিক মূল্যবোধের গল্প রয়েছে। এখানে আমরা আত্মশ্রদ্ধা, ধর্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং পিতামাতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে জানব।

আত্মশ্রদ্ধা

একজন ছাত্রের গণিতে ভীষণ ভয় ছিল। তাই সে পরীক্ষায় ভালো করত না। একদিন শিক্ষক তাকে ডেকে নিয়ে ছোট ছোট গাণিতিক সমস্যা দিলেন। অনেকগুলো সমস্যার সমাধান সে করে ফেলল। শিক্ষক তাতে খুশি হয়ে বললেন, তুমি তো ভালোই গণিত পারো! চাইলেই কিন্তু গণিতে আরও ভালো করতে পারো। শিক্ষকের উৎসাহে সে গণিতের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। শিক্ষকও তাকে মাঝে মাঝে গণিত দেখিয়ে দিতেন। অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রের ভয় কেটে গেলা। সে দেখল, এইতো আমি পারছি! এতে নিজের প্রতি তার ভালো লাগা তৈরি হলো। এটাই হলো আত্মশ্রদ্ধাবোধ। ছাত্রটি ভাবল, তাহলে আর একটু চেষ্টা করি। এভাবে ছাত্রটি গণিতে পারদর্শী হয়ে উঠল। তার এই যে পারদর্শিতা, তা আত্মশ্রদ্ধারই ফলাফল। আসলে গণিতে ভালো করার দক্ষতা তার ভেতরেই ছিল। কিন্তু 'আমি পারি' নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধাটুকু জাগিয়ে তুলতে শিক্ষকমহাশয় তাকে সাহায্য করেছেন। তবে আত্মশ্রদ্ধা জাগাতে যে সবসময়ে কারোর সাহায্য লাগবে, ব্যাপারটা এমনও নয়। আত্মশ্রদ্ধা জাগাতে হলে নিজের প্রকৃত পরিচয় জেনে নিজের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো প্রয়োজন।

'আত্মশ্রদ্ধা' কথাটির মানে নিজেকে শ্রদ্ধা করা। এর জন্য প্রয়োজন নিজের প্রতি ভালো ধারণা রাখা। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু সহজাত বিশেষ ক্ষমতা, কর্মকুশলতা ও বৈশিষ্ট্য থাকে। আত্মশ্রদ্ধা জাগাতে হলে নিজের এই সামর্থ্যগুলো স্পষ্ট করে জানতে হয়। সেইসঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতাগুলোও বুঝতে হয়। আত্মশ্রদ্ধাবান মানুষ সাময়িক ব্যর্থতা দিয়ে নিজের মহিমাকে খাটো করে দেখে না। অন্যের মতো নয় বলে নিজেকে কখনও সামান্য বলে মনে করে না। এমন মানুষ নিজেকে ভালোবাসে। গীতায় বলা হয়েছে—

উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

(গীতা- ৬/৫)

সরলার্থ: নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে। নিজেকে কখনো অবসন্ন ভাববে না। তাহলে নিজেই নিজের বন্ধু হবে। বিপরীতে নিজে শত্রুতে পরিণত হবে।

অর্থাৎ, আত্মশ্রদ্ধার বলে নিজেকে উদ্ধার করতে হয়। কখনো নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে নেই। আত্মশ্রদ্ধাই মানুষের বন্ধু। আত্মশ্রদ্ধাহীনতাই মানুষের শত্রু। আত্ম-অবমাননা কখনও করতে নেই। আমি পাপী, আমি অধম, আমি পতিত, আমি অসহায়- এ রকম বলতে নেই বা মনে করতে নেই। আত্মশ্রদ্ধাবান আত্মশ্রদ্ধাকেই পরম অবলম্বন বলে মনে করেন। কুসঙ্গ, কুকথা ইত্যাদি থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখেন।

কেবল ব্যক্তি জীবনে নয়, জাতীয় জীবনেও আত্মশ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে। নইলে একটি জাতি যথার্থ স্বাধীনতা পায় না। নিজ জাতির ইতিহাস জানতে হবে। নিজেদের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। জাতীয় জীবনদর্শন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এরই ওপরে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। এভাবেই একটি আত্মশ্রদ্ধাবান জাতি সামনে এগিয়ে যায়।

আত্মশ্রদ্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে রামায়ণে আমরা সীতাকে পাই। আমরা এখন সীতার কাহিনি জানব।

রাজা দশরথ বড় ছেলে রামকে রাজা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাধ সাধেন কৈকেয়ী। তার কূটকৌশলে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়। সঙ্গে গেলেন স্ত্রী সীতা আর ভাই লক্ষ্মণ। তের বছর বনবাসে থাকার

পর একদিন ছদ্মবেশে লঙ্কার রাজা রাবণ সীতার কাছে এলেন। সীতা তখন বনের কুটিরে একা ছিলেন। সীতা অতিথি সৎকারের আয়োজন করেন। রাবণ তখন নিজের পরিচয় দিয়ে সীতাকে বনবাস জীবন ছেড়ে তার সঙ্গে লঙ্কায় যাওয়ার প্রস্তাব দেন। সীতা ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। রাবণ তখন সীতাকে জোর করে মায়ারথে তুলে নিয়ে নিজ রাজ্য লঙ্কায় চলে যায়।

রাবণ সীতাকে বশে আনার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু কোনোভাবেই না পেরে তাঁকে অশোকবনে রা-ক্ষসীদের মাঝে বন্দি করে রাখেন। এদিকে সীতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন রাম । একদিন হনুমান লঙ্কা থেকে সীতার খবর আর একটা আংটি নিয়ে রামের কাছে আসেন। তারপর রাম আর লক্ষ্মণ লঙ্কায় উপস্থিত হন। রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত রাবণ সবংশে নিহত হয়। হনুমান অশোকবন থেকে সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের কাছে আসেন। কিন্তু রাম সীতাকে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। অপমানিত সীতা আগুনের চিতায় প্রবেশ করলেন। বললেন, যদি আমি সতী হই এবং রামের প্রতি একনিষ্ঠ থাকি, তবে স্বয়ং অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করবেন। অগ্নিদেব স্বয়ং সীতাকে রক্ষা করেন। রামের কাছে সীতাকে গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। রাম সীতাকে গ্রহণ করেন। তারপর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে আসেন।

রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। আনন্দেই কাটছিল দিন। এরই মধ্যে সীতা অন্তঃসত্ত্বা হন। রাম নিঃসন্দেহ হলেও তিনি জানতে পারেন যে, প্রজাদের মনে সীতার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তাই প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্য রাম সীতাকে বনবাসে পাঠান। সীতা বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আশ্রয় পান। সেখানে সীতার লব ও কুশ নামে যমজ ছেলের জন্ম হয়। বাল্মীকি তাদের নিজের রচিত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করান। এদিকে রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। নিমন্ত্রিত বাল্মীকি মুনির সঙ্গে কুশ ও লব এই যজ্ঞে এসে রামায়ণ গান করেন। তাঁদের গান শুনে

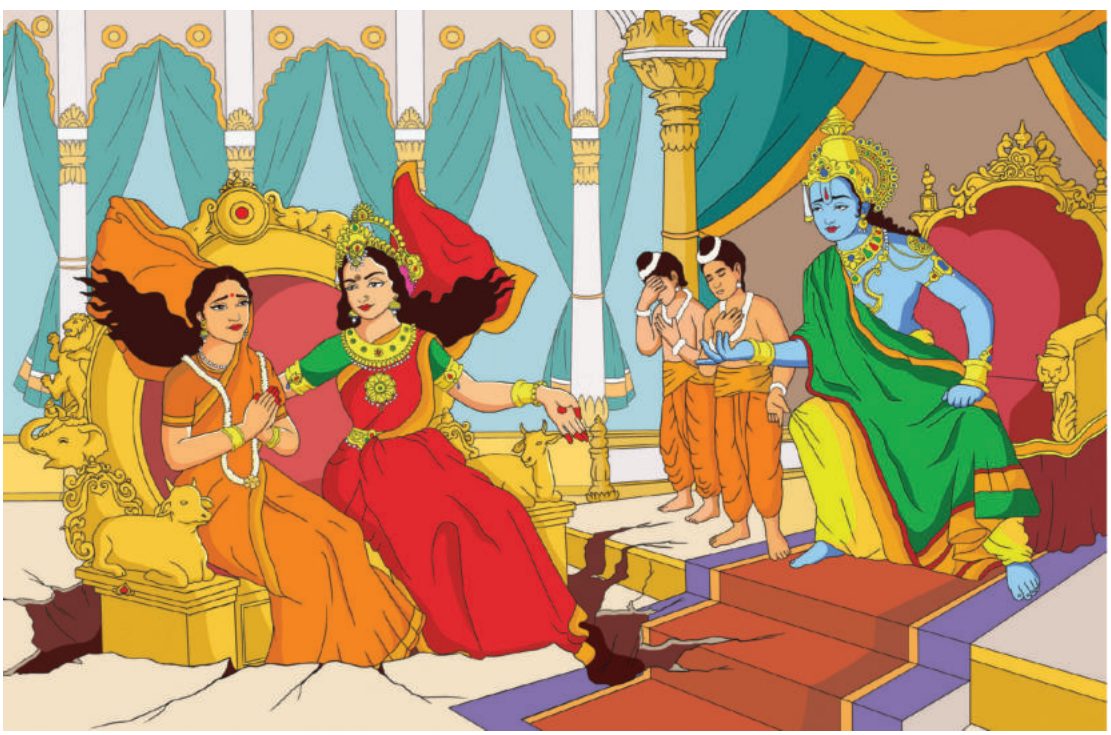

দেবী বসুমতী সীতাকে বাহুতে ধারণ করে সিংহাসনে বসাচ্ছেন

রাম বাল্মীকি মুনির কাছে তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলেন। বাল্মীকি মুনি বলেন, এঁরা তোমারই পুত্র।

বাল্মীকি মুনি লব ও কুশকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যান। সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য রাম বাল্মীকির কাছে সংবাদ পাঠান— সীতা যদি নিষ্পাপ হয়, সে যেন বাল্মীকির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করে এবং সকলের সামনে শপথ করে। বাল্মীকি এই প্রস্তাবে সম্মত হন। বাল্মীকি মুনির আদেশে সীতা লব ও কুশকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। পরদিন সকলের সামনে সীতার শুদ্ধতার পরীক্ষা। কিন্তু তিনি নিজেকে আর অপমানিত হতে দিতে রাজি নন। আত্মশ্রদ্ধাশীল সীতা সর্বসমক্ষে বললেন, আমি যদি সচ্চরিত্রের অধিকারী এবং রাম ভিন্ন অন্য কাউকে মনে মনে চিন্তা না করে থাকি, তবে ধরিত্রী যেন বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দেন। তখন মাটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মাটির নিচ থেকে নাগবাহিত এক আশ্চর্য রথে দেবী বসুমতী উঠে আসেন। তিনি সীতাকে দুহাতে ধরে সিংহাসনে বসান। তারপর সীতাকে নিয়ে তিনি পাতালে প্রবেশ করেন। সীতা পাতালে প্রবেশ করলে রাজা রামচন্দ্রসহ প্রজারা শোকে হাহাকার করতে থাকেন।

এই কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই, সীতা রামের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার পরও বারবার তাঁকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে, পরীক্ষা দিতে হয়েছে, এমনকি শাস্তিও পেতে হয়েছে। সেখানে আমরা তাঁর সহনশীলতা আর ধৈর্যশীলতার পরিচয় পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি আর অপমান সহ্য করতে পারলেন না, তখন তিনি আত্মশ্রদ্ধার পরিচয় দিলেন। নিজের প্রতি সম্মানবোধ থেকে তিনি অসম্মানজনক পরিস্থিতি থেকে সরে গেলেন।

- আমরা প্রত্যেকে যে বক্তব্যগুলো আত্মশ্রদ্ধার বৈশিষ্ট্য সেগুলোর সামনে টিক (✓) চিহ্ন দেই, যেগুলো নয় সেগুলোতে ক্রস (✗) চিহ্ন দিয়ে 'আত্মশ্রদ্ধা-পরিচয়' কাজটি করি।

ছক ৩.৪: আত্মশ্রদ্ধা-পরিচয়

বক্তব্য	টিক (✓) ক্রস (✗)
আত্মশ্রদ্ধাবান মানুষ নিজের ত্রুটিগুলো সম্পর্কে জানেন।	
আত্মশ্রদ্ধা মানুষকে আত্মবিশ্বাস যোগায়।	
আত্মশ্রদ্ধাবান মানুষ কখনও কারোর কাছে মাথা নত করেন না।	
আত্মশ্রদ্ধাবান মানুষ কেবল নিজেকেই শ্রদ্ধা করেন।	
জাতীয় জীবনে আত্মশ্রদ্ধার চর্চা একটি জাতিকে উন্নততর করে।	

ধর্মনিষ্ঠা

যা আমাদের কল্যাণের পথে ধরে রাখে তাই ধর্ম। আর 'ধর্মনিষ্ঠা' কথাটির মানে ধর্মের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, গভীর আস্থা, অটল বিশ্বাস। ধর্মনিষ্ঠ মানুষ সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের চেতনা এবং বিশ্বাসকে হৃদয়ে ধারণ করে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবন-যাপন করে। আমরা কেন ধর্ম পালন করি, সে সম্পর্কে হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে: 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ।'— নিজের চিরমুক্তি, আর জগতের কল্যাণসাধনের জন্য। ধর্মনিষ্ঠা সবরকমের নৈতিক মূল্যবোধের সমষ্টি। যা নৈতিক তাই ধর্ম, যা অনৈতিক তা অধর্ম। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে ধার্মিক বলা হয়।

ধার্মিক ব্যক্তি জগতে সাময়িকভাবে দুঃখভোগ করলেও পরিণামে শান্তি পান। এখানে একজন ধর্মনিষ্ঠ রাজার উপাখ্যান জানব।

অতি প্রাচীনকালে কোশল নামে একটি জনপদ ছিল। সেখানে হরিশ্চন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন। ধর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, দান, ধ্যান ও ন্যায়বিচারের জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত। তাঁর কাছে যে যা চাইত তাই পেত। এই কারণে তিনি দানবীর হিসেবে খ্যাত হন। তাঁর সুনাম স্বর্গ ও মর্ত্যে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন ইন্দ্রের সভায়, বশিষ্ট মুনির মুখে ঋষি বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের দানের সুখ্যাতি শুনলেন। ঋষির ইচ্ছা হলো, হরিশ্চন্দ্র কেমন দানবীর, তা পরীক্ষা করে দেখবেন।

মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে শৈব্যা কাঁদছেন

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় পাঁচজন অপ্সরার নাচের তালভঙ্গ হয়। দেবরাজ ইন্দ্র রেগে গিয়ে তাদের অভিশাপ দেন, তোমরা বিশ্বামিত্রের তপোবনে বন্দিনী হয়ে থাকবে। তখন অপ্সরাগণ হাতজোড় করে দেবরাজের কাছে তাদের মুক্তির উপায় জানতে চান। দেবরাজ ইন্দ্র

বললেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের হাতে তোমাদের মুক্তি হবে। তারা মানুষরূপে বিশ্বামিত্রের তপোবনে বাস করতে থাকে। মানুষরূপী এই অপ্সরা প্রতিদিন তপোবনে ফুল তুলতে গিয়ে গাছের ডালপালা ভেঙে ফেলত। ঋষি বিশ্বামিত্র এই ঘটনায় ভীষণ রেগে পাঁচ কন্যাকে গাছের ডালে বেঁধে রাখেন। একদিন রাজা হরিশ্চন্দ্র শিকারের জন্য তপোবনে আসেন। তাঁকে দেখে বন্দী অপ্সরারা আর্তনাদ করতে লাগল। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাদের বন্ধনমুক্ত করে দিলেন। তারা মুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেল।

বিশ্বামিত্র যখন এই ঘটনা জানতে পারলেন, তখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের ওপরেও তার বড় রাগ হলো। তিনি ছুটে যান রাজা হরিশ্চন্দ্রের সভায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁকে প্রণাম করে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। রাগে আগুন হয়ে বিশ্বামিত্র বললেন, আমি যে কন্যাদের বেঁধে রেখেছিলাম, কার অনুমতি নিয়ে তাদের তুমি ছেড়ে দিলে? রাজা হরিশ্চন্দ্র বললেন, হে মুনিবর, না জেনে আমি বড় অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। এখন আপনি যা চান, আমি তাই দেবো। বিশ্বামিত্র দেখলেন, হরিশ্চন্দ্রের দানশীলতার পরীক্ষা নেওয়ার এটাই সুযোগ। তিনি হরিশ্চন্দ্রের পুরো রাজ্যটাই চেয়ে বসলেন। রাজা হরিচন্দ্র ঋষি বিশ্বামিত্রকে পুরো রাজ্য দান করলেন। দক্ষিনা হিসেবে চাইলেন সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা। রাজা সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডারিকে রাজকোষ থেকে সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসতে বললেন। তখন বিশ্বামিত্র বললেন, হরিশ্চন্দ্র তুমিতো আমাকে পুরো রাজত্ব দান করেছ, তাই রাজকোষও এখন আমার। এর অধিকার তুমি হারিয়েছ। অন্য কোথাও থেকে অর্থ এনে আমাকে দক্ষিণা দাও। আর রানি শৈব্যা আর পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে তুমি আমার রাজ্য থেকে চলে যাও। রাজা বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে সাত দিনের সময় চেয়ে নিলেন। তারপর রাজপোশাক ছেড়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কাশীধামে চলে যান। সেখানে রানি শৈব্যাকে চার কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে এক লোকের কাছে বিক্রি কর দেন। পেছন থেকে রাজপুত্র রোহিতাশ্ব মায়ের আঁচল ধরে কাঁদতে লাগল। শৈব্যার কাকুতি-মিনতিতে লোকটি রোহিতাশ্বকেও সঙ্গে নিল। কিন্তু সে কেবল একজনের খাবারই তাদের দেবে বলে জানাল। এরপর হরিশ্চন্দ্র নিজেকে এক শ্মশান-চণ্ডালের কাছে তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করলেন। এভাবে তিনি বিশ্বামিত্রের দক্ষিণা দিলেন। এভাবে দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র হলেন ডোম আর তাঁর রানি এবং পুত্র অন্যের বাড়ির দাস-দাসী হয়ে রইল।

এভাবে কিছুদিন কাটল। একদিন ফুল তোলার সময়ে একটি কালসাপ রোহিতাশ্বকে দংশন করল। সেখানেই রোহিতাশ্বের মৃত্যু হয়। মৃত পুত্রকে দেখে শৈব্যার জীবনে অন্ধকার নেমে এল। যার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলে ছিলেন, সেই স্নেহের পুত্রও আজ চলে গেল। তিনি পুত্রশোকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, কোথায়, কোথায় রাজা হরিশ্চন্দ্র। একবার এসে দেখে যাও তোমার সন্তানের মৃতদেহ। মরা ছেলেকে কোলে নিয়ে শৈব্যা গেলেন শ্মশানঘাটে।

সেদিন ছিল ভয়ানক দুর্যোগ। ঘোর অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে ঢাকা। ঘাটের কড়ি আদায় করার জন্য হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শৈব্যা মৃত পুত্রকে নিয়ে শ্মশানে উপস্থিত হলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁকে বললেন, ঘাটের কড়ি পঞ্চাশ কাহন না পেলে আমি মড়া পোড়াতে পারবো না । তুমি অন্য ঘাটে চলে যাও। শৈব্যা অপরের কেনা দাসী, তিনি পয়সা কোথায় পাবেন! মনের দুঃখে তিনি হরিশ্চন্দ্রের নাম ধরে কাঁদতে লাগলেন। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোতে হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা ও মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে চিনতে পেরে কেঁদে উঠলেন। শৈব্যাও ডোমের পোশাক পরা রাজাকে চিনে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে দুজনেই অঝর নয়নে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা দুজনেই বললেন, হে প্রভু আমরা সর্বস্ব দান করেছি। বিনিময়ে আজ আমাদের এই দিন দেখালে! তাই এই জীবন আমরা আর রাখব না। এই পুত্রের চিতায় আমরা দুজন

প্রাণত্যাগ করব। তাই চন্দনকাঠের চিতা সাজিয়ে তাতে মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে রাখেন। দুই পাশে পিতা-মাতা শুয়ে পড়লেন। এবার চিতাতে আগুন দিতে যাবেন, এমন সময় স্বয়ং ধর্মরাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে রাজন! ধর্ম ও সত্যের প্রতি তোমার অনুরাগে দেবতারাও তুষ্ট হয়েছেন। তুমি প্রকৃতই ধার্মিক ও সত্যবাদী। ধর্মরাজ রোহিতাশ্বের গায়ে হাত বোলাতে সে বেঁচে উঠল'। বিশ্বামিত্রও তখন সেখানে এসে বললেন, 'হরিশ্চন্দ্র, তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তুমি সত্যই দানবীর। ধন্য তোমার জীবন। তোমার এই দান ও ত্যাগের মহিমা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। তোমার রাজ্য তুমি ফিরিয়ে নাও। রাজ্যে ফিরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে রাজ্যসুখ ভোগ করো এবং প্রজাদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করো'।

- এসো আমরা প্রত্যেকে তিনটি পয়েন্টে 'ধর্মনিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য' লিখি।

ছক ৩.৫: ধর্মনিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য

১.
২.
৩.

- ধর্মনিষ্ঠার কারণে আজও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি সকলের মনে জায়গা করে আছে। তিনি রাজ্যসুখ, স্ত্রী-পুত্র সব ত্যাগ করেও ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হননি। ধর্মনিষ্ঠার গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

অধ্যবসায়

জীবনে চলার পথে আছে বাধা, আছে বিঘ্ন। এসব বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে কোনো কাজে সাফল্য লাভের জন্য বারবার চেষ্টা করার নামই অধ্যবসায়। চেষ্টা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে অধ্যবসায় নামক নৈতিক গুণটি গড়ে ওঠে। পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণকর সবই অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। তাই মানব সভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি হলো অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ বড় হয়। অসাধ্য সাধন করতে পারে। কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলেছেন।

পাঁচজনে পারে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা
পার কিনা পার কর যতন আবার
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

অধ্যবসায়ের গুণে মানুষ কেমন করে অসাধ্যকে সাধন করে তা এখানে আমরা বোপদেব গোস্বামীর অধ্যবসায়ের

গল্পের মাধ্যমে জানব।

প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। তখনকার দিনে প্রাচীনভারতে বিদ্যালয়কে টোল বলা হতো। মহারাষ্ট্রের অধিবাসী বোপদেব গোস্বামী টোলে পড়ালেখা করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ক্লাসের সবচেয়ে অমনোযোগী ছাত্র। পন্ডিত মহাশয় ক্লাসে ব্যাকরণের যেসব সূত্র শেখাতেন, বোপদেব সেসব কিছুই বুঝতে পারতেন না। মনেও রাখতে পারতেন না। এ কারণে তিনি প্রতিনিয়ত টোলে অপমানিত হতেন। পন্ডিত মহাশয় তাঁর মূর্খতায় খুবই বিরক্ত ছিলেন। তিনি রেগে গিয়ে বোপদেবকে বলতেন, এমন আপদ টোলে আসার চেয়ে টোল বন্ধ হয়ে যাওয়া বরং ভালো। একদিন পন্ডিত মহাশয় বোপদেবকে টোল থেকে বের করে দেন। বলে দেন, সে যেন আর টোলে না আসে। মনে একরাশ দুঃখ নিয়ে মাথা নিচু করে টোল থেকে বেরিয়ে যান বোপদেব। টোল থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে হতাশা ঘিরে ধরে তাঁকে। তিনি ভাবতে থাকেন, আমি সত্যিই খুব খারাপ ছাত্র। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নেই । আমাকে দিয়ে আর লেখাপড়া হবে না। কিন্তু আমিতো ব্যাকরণের সব সূত্র মনে রাখতে চাই। ক্লাসের পড়া বুঝতে চাই। অথচ কিছুতেই মনে থাকে না! কিছুই বুঝি না। মনের দুঃখে বোপদেব বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। একদিন তাঁর খুব পিপাসা পেয়েছিল। তিনি একটি সানবাঁধানো পুকুরঘাটে যান । জলপান শেষে তিনি পুকুরের ঘাটে বসে থাকেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল ঘাটের পাথরের উপর একটি গোল গর্ত। পুকুরের সানবাঁধানো ঘাটের পাথরগুলো সব ঠিকঠাকই আছে। শুধু একটি নির্দিষ্ট জায়গাতেই গোল চাকতির মতো ঐ গর্ত। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, শক্ত পাথরের গায়ে কেমন করে এ রকম গর্ত হলো? মনে মনে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলেন। এমন সময়ে একজন মহিলা ঐ পুকুর-ঘাটে এল। তার কাঁখে একটি মাটির কলসি। কলসিতে জল ভরে তিনি নামিয়ে রাখেন গর্ত হওয়া পাথরের উপর। তারপর জলভরা কলসি নিয়ে মাহিলাটি বাড়ি চলে যান।

বোপদেব তখন বুঝলেন, দিনের পর দিন সানবাঁধানো ঘাটে জলভরা মাটির কলসি নির্দিষ্ট স্থানে বারবার রাখার ফলে কলসির ঘষায় ঘষায় কঠিন পাথরের উপর কলসির মাপে গর্ত হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি চিন্তা করলেন, কী আশ্চর্য! মাটির কলসির অবিরাম ঘর্ষণে পাথরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। নিরেট পাথরের বুকে দিনের পর দিন মাটির কলসির রাখার ফলে যদি গর্ত হতে পারে তাহলে বারবার পাঠ করলে আমিইবা পড়া মনে রাখতে পারব না কেন! কেনইবা বারবার চেষ্টা করেও বুঝতে পারব না! নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমি কি পাথরের চেয়েও নিরেট? তিনি বুঝলেন, বারবার চেষ্টা করলে আমি নিশ্চয়ই ব্যাকরণশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হব। তিনি হতাশা ত্যাগ করে ছুটে গেলেন পন্ডিত মহাশয়ের কাছে। গিয়ে বললেন নিজের উপলব্ধির কথা।

মাটির কলসের দ্বারা পাথর ক্ষয়

পন্ডিত মহাশয় অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন বোপদেবের দিকে। এইতো, এইতো তাঁর চোখ খুলেছে! মনের বিস্তার ঘটেছে। মন ভাবতে শিখেছে! এতদিন তিনি তো বারবার বোপদেবকে ভাবাতেই চেয়েছিলেন। সেই চিন্তনের পাঠ বোপদেব পেয়েছেন প্রকৃতির কাছ থেকে। যে পুত্রসম ছাত্রকে তিনি টোল থেকে বের করে দিয়েছিলেন, তাঁকেই পরমস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

এরপর বোপদেব ব্যাকরণশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা করতে লাগলেন। পন্ডিত মহাশয়ের সহায়তায় তিনি দুর্বোধ্য ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে সক্ষম হলেন। একসময়ে বোপদেব নিজেই সংস্কৃত ব্যাকরণকে সূত্রায়িত করেন। যে ব্যাকরণশাস্ত্র ছিল একসময়ে একেবারেই দুর্বোধ্য, সেই শাস্ত্রের সূত্রগুলো নিয়েই বোপদেব রচনা করেন একটি আধুনিক ব্যাকরণগ্রন্থ। বোপদেবের এই বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ'। এমন সহজবোধ্য ব্যাকরণ সেকালে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। ব্যাকরণশাস্ত্রকে সরলতম করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর লেখা এই ব্যাকরণ বই ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। বোপদেব কবিকল্পদ্রুম ও তার কামধেনু টীকা, মুক্তাফল ও হরিলীলা বর্ণনা, শতশ্লোকী ও ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

অপমান থেকে আত্মজিজ্ঞাসা, ক্ষণিকের দেখা থেকে দর্শন বোপদেবের চোখ খুলে দিয়েছিল। কঠোর সংকল্প ও অধ্যবসায়ের এক অনবদ্য নজির স্থাপন করেন ক্লাসের সবচেয়ে নির্বোধ পড়া-না-পারা ছাত্রটি। কঠোর অধ্যবসায়ের বলে মানুষ কী করে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে, বোপদেব গোস্বামীর গল্পটি তার অনবদ্য উদাহরণ।

- আমরা প্রত্যেকে নিজের জীবনের কোনো একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করি যেখানে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করতে চাই। কীভাবে কাজটি করব, বুঝিয়ে 'সাফল্য-সূত্র' ঘরে লিখি।

ছক ৩.৬: সাফল্য-সূত্র ছক

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

মাতা ও পিতা আমাদের পরম গুরু। হিন্দুধর্ম মতে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। অর্থাৎ জননী ও জন্ম-ভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

পিতা সম্পর্কে হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।।

অর্থাৎ পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতা প্রীত হলে সকল দেবতা তুষ্ট হন।

যা কিছু করা হয় তাই কর্ম। আর যেসব কর্ম অনুশীলন করা আবশ্যক তাই কর্তব্য। কর্তব্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধকে বলে কর্তব্যবোধ। পৌরাণিক কাহিনিতে আমরা মাতাপিতার প্রতি কর্তব্যবোধের অনেক উদাহরণ দেখেছি। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বছর বনবাস করেছিলেন, ভীম মায়ের আজ্ঞায় রাক্ষসের মুখে যেতেও কুণ্ঠিত হননি। শাস্ত্র অনুযায়ী, মাতাপিতার প্রতি ভক্তিমান নয় এমন সন্তান কাম্য নয়। মাতা-পিতার সঙ্গে সবসময়ে নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে কথা বলা প্রত্যেকটি সন্তানের একান্ত কর্তব্য। তাদের জীবনে যখন বার্ধক্য আসে, কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে হয়, তখন অনেকেই অন্যের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। শৈশবে সন্তান যেমন মাতাপিতার প্রতি একান্তভাবে নির্ভর করত, ঠিক তেমনিভাবে বৃদ্ধাবস্থায় তাদের দায়িত্ব নেওয়া প্রত্যেকটি সন্তানের জন্য আবশ্যক। যে সন্তান পরিণত বয়স পর্যন্ত মাতাপিতার সেবা করার সুযোগ পান তিনি ভাগ্যবান। নিজের কর্ম এবং চরিত্র দ্বারা মাতাপিতাকে তুষ্ট করা প্রত্যেকটি সন্তানের অবশ্য কর্তব্য।

- আমরা প্রত্যেকে মাতাপিতার প্রতি নিজে পালন করি এ রকম তিনটি কর্তব্যের কথা 'আমার কর্তব্যবোধ' ছকে লিখি।

ছক ৩.৭: আমার কর্তব্যবোধ

১.
২.
৩.

এখানে আমরা মাতাপিতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ এক পুত্রের কাহিনি জানব। রামায়ণে এই গল্প আছে।

সিন্ধুমুনি ছিলেন অত্যন্ত মাতৃপিতৃভক্ত। তাঁর পিতা ও মাতা দুজনেই ছিলেন অন্ধ। মুনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে মা-তাপিতার সেবা করতেন। তাঁর পিতা অন্ধকমুনি নামে পরিচিত ছিলেন। সিন্ধুমুনি তাঁর অন্ধ পিতামাতাকে একটা ভারে করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতেন। একবার তাঁর মাতা-পিতার তীর্থযাত্রার ইচ্ছে হলো। পুত্র সিন্ধুমুনি তাঁদের ভারে তুলে কাঁধে করে রওনা হলেন। পথে মাতা-পিতা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন।

সিন্ধুমুনি তাঁদের জন্য জল আনতে কলসি নিয়ে সরযূ নদীতে যান। এসময়ে অযোধ্যার রাজা দশরথ সেই বনে শিকার করতে আসেন। শিকার খুঁজে খুঁজে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। দশরথ তখন সেই জলাশয়ের তীরে একটি গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। সিন্ধুমুনি যখন কলসিতে জল ভরছিলেন, রাজা দশরথের কানে সে শব্দ পৌঁছায়। তিনি চোখে না দেখে কেবল শব্দ শুনেই তীর ছুঁড়ে শিকার করতে পারতেন। একে বলে শব্দভেদী বাণ। রাজা দশরথ কলসিতে জল ভরার শব্দকে হরিণের জল খাওয়ার শব্দ বলে ভাবলেন। তিনি শব্দের দিকে লক্ষ করে বাণ ছুঁড়ে মারেন। সেই বাণ সিন্ধুমুনিকে বিদ্ধ করে। বাণবিদ্ধ মুনি সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন। হরিণ শিকার করেছেন ভেবে রাজা দশরথ সেটি আনতে যান। কিন্তু এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে দশরথ ভীষণ অনুতপ্ত হন। তিনি শুশ্রূষা করে সিন্ধুমুনির জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন। দশরথের অনুতাপ দেখে মুমূর্ষু সিন্ধুমুনি তাঁকে আর কোনো অভিশাপ দেননি। মৃত্যুকালে তিনি নিজের জীবনের জন্য কোনো দুঃখও করেননি। কেবল অন্ধ মাতাপিতার আসন্ন কষ্টের কথা ভেবে তাঁর হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠল। মুনি গভীর দুঃখে বললেন, আমার বৃদ্ধ মাতাপিতার শুশ্রূষা আর ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়িত্ব ছিল আমার ওপরে। আমাকে ছাড়া তাঁরা কী করে বাঁচবেন! তাঁরা কী করে পুত্রশোক সহ্য করবেন! মৃত্যুর আগে সিন্ধুমুনি দশরথের কাছে বললেন, আমাকে মাতাপিতার কাছে নিয়ে চলো। এদিকে সিন্ধুমুনির মাতাপিতা ছেলের দেরি দেখে দুশ্চিন্তা করছিলেন। পাতার মচমচ শব্দ শুনে তারা ভাবলেন, এই বুঝি ছেলে এল! কিন্তু দশরথের কোলে সন্তানের মৃতদেহ রয়েছে বুঝতে পেরে তাঁরা হাহাকার করে উঠলেন। অন্ধকমুনি রাজা দশরথকে পুত্রহারা হওয়ার অভিশাপ দিলেন।

সিন্ধুমুনি মাতাপিতাকে ভারে করে নিয়ে যাচ্ছেন

সিন্ধুমুনি মৃত্যুকালে রাজা দশরথকে নিজের মাতাপিতার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছিলেন। অন্ধকমুনির অভিশাপ সত্ত্বেও দশরথ তাঁদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

প্রত্যেক মানুষেরই সবটুকু সাধ্য দিয়ে মাতাপিতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা উচিত। সিন্ধুমুনির জীবন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কর্তব্যবোধের কারণে তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর এই দৃষ্টান্ত সকলের জন্য অনুকরণীয়।

- চলো, আমরা প্রত্যেকে ধাপে ধাপে 'মঙ্গলময় উদ্যোগ' কাজটি করি।

নিজের মা/ বাবা/ অভিভাবক— যে-কোনো একজনের সারাদিনের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে তালিকাটি তৈরি করি।

ছক ৩.৮: অভিভাবক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ

যাঁর কাজ পর্যবেক্ষণ করেছি	সারাদিনের সময়	কী কী কাজ করেন	তাঁর এই কাজ কার কার প্রয়োজন মেটায়
	সকাল থেকে দুপুর		
	দুপুর থেকে সন্ধ্যা		
	সন্ধ্যা থেকে রাত		

তাঁর কাজের ফলে আমার যেসব মঙ্গল/ভালো হয় সেগুলোর তালিকা করি।

ছক ৩.৯: আমাদের মঙ্গলের তালিকা

বাবার/ মায়ের/ অভিভাবকের প্রয়োজন বুঝে তাঁর জন্য নিজের হাতে একটি উপহার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে এনে সবাইকে দেখাই।

উপহারটি পেয়ে মা/ বাবা/ অভিভাবকের অনুভূতি মন্তব্য হিসেবে লিখে আনি।

যে উপহারটি দিয়েছি	যে কারণে এটি দিয়েছি	মা/ বাবা/ অভিভাবকের মন্তব্য

- চলো, আমরা সবাই মিলে নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার জন্য 'ইথিক্স ক্লাব' গঠন করি। সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে 'ইথিক্স ক্লাব কার্যক্রম' এর তালিকা করে প্রত্যেকে লিখে রাখি। (তিনটি দেওয়া আছে আরও নতুন তিনটি লিখি।

ছক ৩.১০: ইথিক্স ক্লাব কার্যক্রম তালিকা

১. নিজেদের করা ভালো কাজগুলো এবং নিজেদের অনুভূতি সদস্যদের সামনে নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করব।

২. নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলাপ করব।

৩. ব্যক্তিগত এবং দলীয়ভাবে ভালো কাজ করার পরিকল্পনা করব এবং তা বাস্তবায়ন করব।

৪.

৫.

৬.

ইথিক্স ক্লাব-কার্যক্রমের শুরুতে আমরা প্রত্যেকে প্রথমে নিচের কাজদুটো করি।

- 'আমার মূল্যবোধ' তালিকাটি ব্যবহার করে, ফুলের ছবিটির প্রত্যেক পাঁপড়িতে একটি করে নৈতিক মূল্যবোধের নাম লিখি। (প্রয়োজনে আরও কিছু পাঁপড়ি এঁকে নিই।) যদি তালিকাটি তৈরির পরে আমি নতুন কোনো মূল্যবোধের নাম জানতে পারি, সেগুলোর নামও লিখি।

মূল্যবোধের ফুল

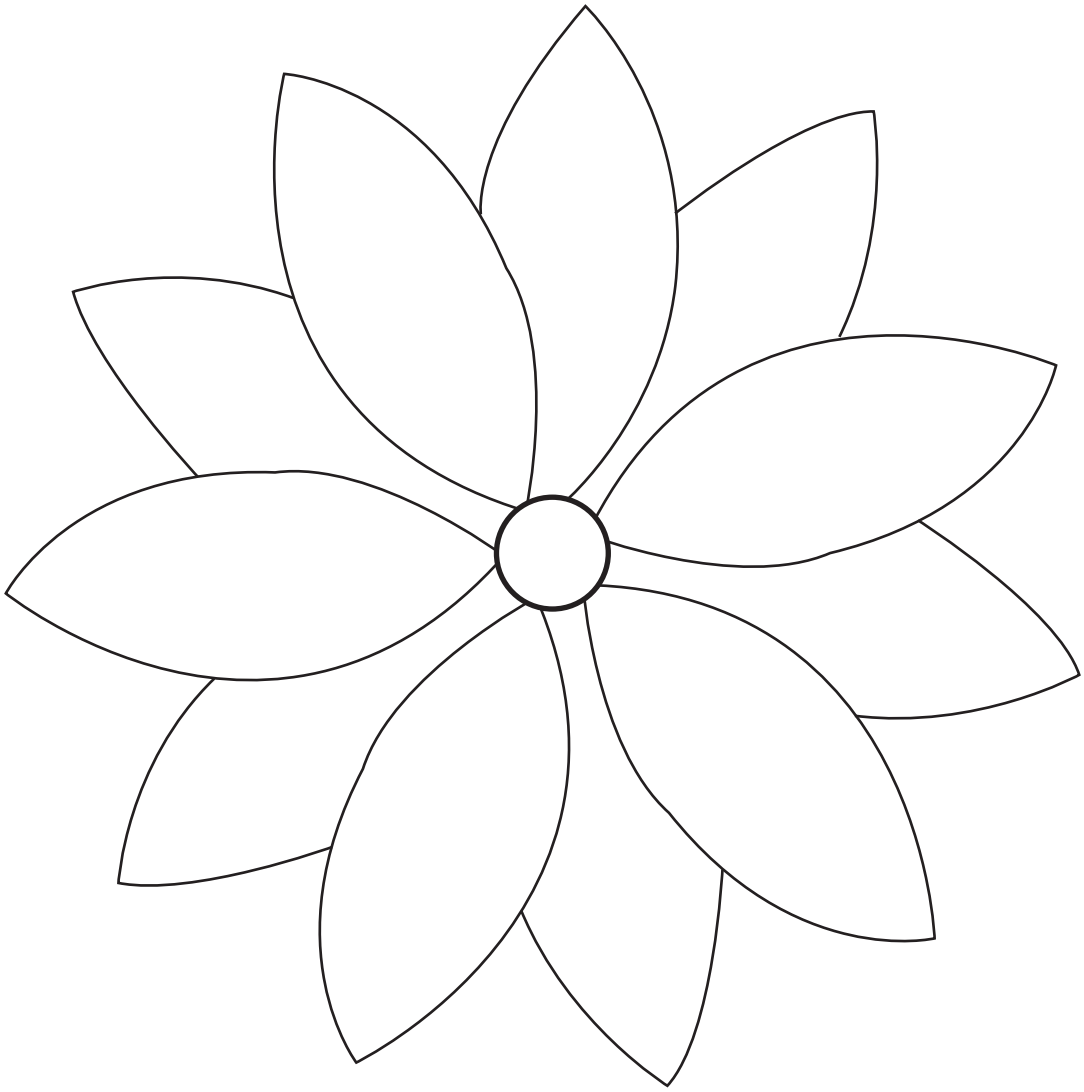

- আমরা প্রত্যেকে প্রতি সপ্তাহে মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এ রকম অন্তত একটি কাজ করব। মোট পাঁচ সপ্তাহে পাঁচটি কাজের কথা লিখে ‘চেতনার পরিচয়’ ছকটি পূরণ করব।

ছক ৩.১১: চেতনার পরিচয়

নৈতিক মূল্যবোধের নাম	তারিখ	কাজের বর্ণনা	আমার অনুভূতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদর্শ জীবনচরিত ও ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান

ইন্দ্রাণী বাবা-মায়ের সঙ্গে দাদুর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে। কতদিন ধরে তার জন্য তোড়জোড়! ছুটি নেওয়া, কেনাকাটা, গোছগাছ, বাসের টিকিট কাটা— কত প্রস্তুতি! শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিনে তারা রওনা দিল। বাসে ওঠার সময়ে বাবা বললেন, তাড়াহুড়ো করো না। আগে লোকজনকে নামতে দাও, তারপরে ওঠো। বাসে উঠে ইন্দ্রাণীর জানালার পাশের সিটটায় বসার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সেখানে এক ভদ্রমহিলা বসে ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি চাইলে এখানটায় বসতে পার। ও খুব খুশি হয়ে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে জানালার পাশে গিয়ে বসল। একটু পরেই গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নামল। সকাল থেকে আজ ভ্যাপসা গরম। এই বৃষ্টিটা ওর কি যে ভালো লাগল! ইন্দ্রাণী জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল গায়ে মাখতে চাইল। কিন্তু পাশের সিট থেকে ভদ্রমহিলা ওকে বললেন, হাতটা ভেতরে ঢোকাও। চলন্ত গাড়িতে এ রকম করা খুব বিপজ্জনক। ইন্দ্রাণী একটু বিব্রত হলো, সত্যিই তো! একটু পরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। বৃষ্টির ছাঁট ওর শরীরেও লাগছিল। আহ্, কী আরাম! কিন্তু মা বললেন, জানালাটা বন্ধ করো। অন্যদের অসুবিধা হচ্ছে। বাসটা যখন ওর দাদুর বাড়ির স্টপেজে থেমেছে, বৃষ্টিটা তখন আর নেই। ইন্দ্রাণীরা বাস থেকে নামছে। ওর ইচ্ছে ছিল বাসের দরজা থেকে এক লাফে নামবে। ঠিক তখনই বাবা পেছন থেকে বলল, বাঁ পা আগে দেবে, তারপরে ডান পা। 'উফ্, কত যে নিয়ম-কানুন!' ইন্দ্রাণীর কণ্ঠে বিরক্তি। মা বললেন, 'সব জায়গার মতন পথে বের হবারও কিছু নিয়ম-কানুন থাকে। নিয়ম মেনে চলাটা একটু অসুবিধের বলে মনে হয়, কিন্তু কোনো নিয়ম না থাকলে পদে পদে অসুবিধে হতে থাকে'। ইন্দ্রাণী নিজের আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে বাবা-মায়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করল। মা হাসলেন। বাবা ওর হাত ধরে বললেন, ঠিক আছে। চলো এবার।

ইন্দ্রাণীর মতন আমাদেরও হয়তো মাঝে মাঝে নিয়ম-কানুন মানতে অসুবিধা বোধ হয়। কিন্তু কোনো নিয়ম না থাকলে বেড়াতে যাওয়াই হোক, কী বিদ্যালয়ের ক্লাস করাই হোক, কত যে অসুবিধা হয়, তা তো আমরা সবাই বুঝি। আজকে আমরা ক্লাসের বাইরে ক্লাস করব। অর্থাৎ ফিল্ড ট্রিপে যাব। আমাদের গন্তব্য হবে কোনো মন্দির সেবাশ্রাম কিংবা হিন্দুধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বেড়াতে যাওয়ার মত ফিল্ড ট্রিপে যাওয়ারও কিছু নিয়ম-কানুন আছে।

- আমরা সবাই মিলে ফিল্ড ট্রিপে যাওয়ার জন্য কিছু নিয়ম তৈরি করে প্রত্যেকে 'ফিল্ড ট্রিপে পালনীয় নিয়মাবলি' ছকে লিখে রাখি।

ছক ৩.১২: ফিল্ড ট্রিপে পালনীয় নিয়মাবলি

১.
২.
৩.
৪.
৫.

- 'ফিল্ড ট্রিপের অনুমতিপত্র' ছকে আমরা প্রত্যেকে নিজের অভিভাবকের অনুমতি নিই।

অনুমতি পত্রের নমুনা

আমার সন্তান/ পোষ্য (শিক্ষার্থীর নাম) .... তারিখে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে হিন্দুধর্ম বিষয়ের ওপর ফিল্ড ট্রিপে যাবে। এ বিষয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই।
অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ
.....

ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে সবকিছু মন দিয়ে দেখব। নানান বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নেব। যেমন: প্রতিষ্ঠানটি কী কী কাজ করে, প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠানটি কী কী সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা বা সেবায়েত অথবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো মহামানবের জীবন, কর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি। এই তথ্যগুলো নিচের ছক আকারে সংক্ষেপে খাতায় লিখে রাখব।

ছক ৩.১৩ (ক): তথ্য সংগ্রহের নমুনা

প্রতিষ্ঠানের নাম :

ধর্মীয় কাজ	সেবামূলক কাজ

ছক ৩.১৩ (খ): প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ/ সীমাবদ্ধতাসমূহ

ছক ৩.১৩ (গ): প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ছক ৩.১৩ (ঘ): প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার (সেবায়েত/ সংশ্লিষ্ট মহামানব) জীবন, কর্ম ও দর্শন

মানুষ যুগে যুগে জীবনের উৎস, উদ্দেশ্য আর পরিণতির কথা ভেবেছে। তার মনে তৈরি হয়েছে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা প্রশ্ন। সেসব প্রশ্নের উত্তর সে কখনো খুঁজেছে ধর্মে, কখনো বিজ্ঞানে, কখনো দর্শনে, কখনোবা নিজের অন্তরে। আবার যুগে যুগে যেসব মহামানব জন্মেছেন তাঁদের জীবনদর্শনও অপরের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছে। আমরা এখানে হিন্দুধর্মের কয়েকজন আদর্শ মানুষের কথা জানব। যাঁরা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য। তাই তাঁরা কেবল নিজের ভালোর কথা না ভেবে ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির মঙ্গলের কথা ভেবেছেন। ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টির সেবার জন্য তৈরি করেছেন বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। এসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা ইহলোক ত্যাগ করার পরও স্রষ্টা ও সৃষ্টির সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন। এবার আমরা এরূপ কয়েকজন মহামানব এবং মহামানবদের প্রতিষ্ঠিত দুটি ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কথা বিশদভাবে জানবো।

হরিচাঁদ ঠাকুর

হরিচাঁদ ঠাকুর

গোপালগঞ্জ জেলার সাফলিডাঙ্গা গ্রামে বাস করতেন যশোমন্ত ঠাকুর ও অন্নপূর্ণা দেবী দম্পতি। তাঁরা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। লোকশ্রুতি আছে, অন্নপূর্ণা দেবী একদিন ভাবাবেশে দেখতে পান শিশু কৃষ্ণ তাঁকে 'মা' 'মা' বলে ডাকছেন। আর তাঁর স্তন্য পান করছেন। সেদিন সাধু রমাকান্ত এলেন তাঁদের বাড়িতে। অন্নপূর্ণা দেবীর ভাবাবেশের ঘটনা শুনে তিনি বললেন, 'মা, তোমার গর্ভে বাসুদেব জন্মগ্রহণ করবেন'। এর কিছুদিন পরে ১৮১২ সালের ১১ মার্চ, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে তাঁদের কোলে এলো এক পুত্রসন্তান। নাম রাখা হলো হরিদাস। ছোট্ট শিশু হরিদাস কালক্রমে ভক্তদের মুখে মুখে হয়ে ওঠেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

তখনকার সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে হরিচাঁদ ঠাকুরের পাঠশালায় যাওয়া হয়নি । দিনের বেশিরভাগ সময় কাটতো বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে গরু চড়িয়ে। তাঁর সুন্দর চেহারা, অমায়িক ব্যবহার, মধুর স্বরের গান, ভজন, কীর্তন সবাইকে মুগ্ধ করত। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও প্রখর বুদ্ধিমত্তা তাঁর মনকে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলেছিল। সেই সময়ের গ্রাম-গঞ্জে চিকিৎসার তেমন সুযোগ ছিল না। ওঝাদের ঝাঁড়ফুক, তাবিজ-কবচই ছিল মূল ভরসা। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজস্ব প্রজ্ঞার বলে গ্রামের লোকদের রোগমুক্তির জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসার নানা বিধান দিতেন। সেইসঙ্গে রোগীর মনোবল বৃদ্ধির জন্য রোগীকে সঙ্গে নিয়েই হরিবোল নামের কীর্তন করতেন। এই চিকিৎসা এবং নামকীর্তনের ফলে রোগীর মানসিক শক্তি বেড়ে যেত, যার ফলে অধিকাংশ রোগেরই উপশম হতো। তিনি অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু হরিনামে ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। লোকে যে-কোনো সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে হরিনাম করতে বলতেন। তাতেই ঘটত আশ্চর্য ঘটনা— গিরিধর বালার জ্বর সেরে গেলো, গোস্বামী গোলোকের গলার ব্যথার নিরাময় হলো, মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের পিত্ত যন্ত্রণার অবসান হলো, অন্ধ রামধন ফিরে পেলো দৃষ্টিশক্তি। এমনকি কবি আনন্দ সরকারের পুত্র লাভ হলো। লোকের মুখে মুখে রটে গেলো— হরিচাঁদ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

ছোটবেলা থেকেই হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির । বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই ভাবটি বাড়তে থাকে। তাঁর মধ্যে ধর্মভাব প্রবল হতে থাকে। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমভক্তির বহমান ধারাকে আরও সহজভাবে এগিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলতেন, "ভক্তির সঙ্গে হরির নাম নিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে।" তাঁর মতের সরল ব্যাখ্যা এ রকম, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ঐক্যের সুর আছে। এই সুরটি প্রেমের সুর। আর এই প্রেমের ঘনীভূত নির্যাস নিহিত আছে হরিনামে। হরিনাম যে করে সে প্রেমের সমুদ্র মন্থন করে। সমুদ্র মন্থনে

যেমন অমৃত উঠে এসেছিল, তেমনি হরিনামের মাধ্যমে ভক্তের সামনে উঠে আসে ঈশ্বর স্বরূপ অমৃত মাধুরী। সেই অমৃত মাধুরীর মধ্যে অবগাহন করার মানে ঈশ্বরের সাথে মিশে যাওয়া। ঈশ্বরকে পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হরিনাম করা। তাঁর হরিনাম সংকীর্তনের এই সাধন-ভজনের পথ বা মতবাদের নাম 'মতুয়াবাদ'। আর তাঁর অনুসারীদের বলা হয় 'মতুয়া'। এর অর্থ যারা হরিপ্রেমে মত্ত থাকে। মতুয়াবাদের মূল কথা হচ্ছে মনুষ্যত্ব অর্জন, আত্মোন্নতি এবং সার্বিক কল্যাণ সাধন। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা–এই তিনটি স্তম্ভের ওপর মতুয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত।

হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজের পিছিয়ে পড়া, নিপীড়িত মানুষের জন্য আজীবন কাজ করেছেন। কৃষকদের প্রতি নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমার জোনাসুর নীলকুঠি অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সংসার প্রতিপালনের জন্য তাঁকে গ্রামে গ্রামে জিনিসপত্র ফেরি করা থেকে শুরু করে চাষাবাদ— সবই করতে হয়েছে। তিনি গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং উন্নততর পদ্ধতিতে অনাবাদী জমি চাষের ব্যবস্থা করেন। তিনি অনগ্রসর, নিষ্পেষিত মানুষের আত্মশক্তি-কে জাগানোর ওপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। চেয়েছেন, শত শতাব্দীর বিধিনিষেধ আর অত্যাচারের অবসান। তিনি সবাইকে কাজ করতে বলেছেন। সন্ন্যাসধর্মে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। বরং সংসারের দায়িত্ব পালনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি নিজেও শান্তিবালা দেবীকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন। জাতির উন্নতির জন্য সকলের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি স্বল্পকালীন জীবদ্দশায় তখ-নকার পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষার প্রসারে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর এ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে নির্দেশ দিয়ে যান। হরিচাঁদ ঠাকুর সংঘবদ্ধতার ওপর জোর দেন। মতুয়াবাদীরা তাই তৈরি করেছেন মতুয়া মহাসংঘ।

হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তদের বারোটি উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলো 'দ্বাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত।

১. সদা সত্য কথা বলবে।

২. পিতা-মাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।

৩. নারীকে মাতৃজ্ঞান করবে।

৪. জগৎকে প্রেম করবে।

৫. সকল ধর্মের প্রতি উদার থাকবে।

৬. জাতিভেদ করবে না।

৭. হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে।

৮. প্রতিদিন প্রার্থনা করবে।

৯. ঈশ্বরে আত্মদান করবে।

১০. বহিরঙ্গে সাধু সাজবে না।

১১. ষড়রিপুকে বশে রাখবে।

১২. হাতে কাম মুখে নাম।

মতুয়াবাদের ত্রিকোণ লাল রঙের পতাকার তিনদিকে সাদা প্রান্তরেখা। লাল রং বিপ্লবের প্রতীক এবং সাদা শান্তির প্রতীক। সম-অধি-কারের ভিত্তিতে সমাজের সকলের সহাবস্থা-নের শান্তিময় পরিবেশ তৈরির জন্য বিপ্লব। মতুয়ারা সংঘবদ্ধভাবে নিশান উড়িয়ে, জয়-ডঙ্কা, কাঁসর, শিঙা বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন ও নৃত্য করেন।

মতুয়াবাদে পিতামাতাই হলেন প্রধান ঈশ্বর। তাঁরাই সৃষ্টিকর্তা। তাঁরা সন্তানকে লালন-পালন করে মানুষ করে তোলেন। সন্তানেরও প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো পিতামাতার সেবা করা, তাঁদের দুঃখকষ্ট, অভাব-অভিযোগের আশু সমাধান করা।

সমস্ত মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাই মতুয়াধর্মের মূল উদ্দেশ্য। নারীর প্রতি সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের বি-রুদ্ধেও হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর মত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নারীকে অবজ্ঞা করে আদর্শ গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না। নারী গৃহের কেন্দ্রস্থল। নারীকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মপথে অগ্রসর হতে হয়। এজন্যই তিনি নারীশিক্ষা, নারীর মর্যাদা দান ও অধিকার রক্ষার জন্য সবাইকে নির্দেশ দেন।

- আমরা প্রত্যেকে হরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা থেকে এমন তিনটি আজ্ঞা বেছে নিই, যেগুলো নিজে পালন করতে পারব বলে মনে করি। 'আজ্ঞাপালন' ছকে আজ্ঞাগুলো এবং সেগুলোর মানে নিজে যা বুঝেছি, তা বুঝিয়ে লিখি।

ছক ৩.১৪: আজ্ঞাপালন

আজ্ঞা	১.	২.	৩.
অর্থ			

১৮৭৮ সালের ৬ মার্চ হরিচাঁদ ঠাকুর ইহলীলা সংবরণ করেন। ঠাকুরের জীবন ও আদর্শ নিয়ে হরিভক্ত কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার রচনা করেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে মানেন। তাঁরা বলেন-

রাম হরি কৃষ্ণ হরি হরি গোরাচাঁদ।
সর্ব হরি মিলে এই পূর্ণ হরিচাঁদ।।

ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তাঁর ছেলে গুরুচরণ 'গুরুচাঁদ' নামে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে পূজিত হন। বাংলা-দেশের বিভিন্ন এলাকায় হরিমন্দির আছে। সেসব মন্দিরে ভক্তগণ নিয়মিত নামকীর্তন করেন, হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দিতে আছে প্রধান হরিমন্দির। সেখানেই মতুয়া সম্পদায়ের মূল কেন্দ্র। প্রতিবছর চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে অর্থাৎ হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথিতে ওড়াকান্দিতে মহাবারুণী স্নান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিনদিন পর্যন্ত বারুণী মেলা বসে। এই স্নান ও মেলায় হাজার হাজার ভক্ত ও পর্যটকের সমাবেশ ঘটে।

- হরিচাঁদ ঠাকুর যেমন সমাজের নানান সমস্যা অনুভব করে তার সমাধানের পথও দিয়েছিলেন। তাঁর কর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা প্রত্যেকে সমাজের দুটো সমস্যা খুঁজে 'সমাজকর্ম' ছকে সমাধানের পথ দেখাই।

ছক ৩.১৫: সমাজকর্ম

সমস্যা	সমাধান

মা আনন্দময়ী

১৮৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া (তৎকালীন ত্রিপুরা) জেলার খেওড়া গ্রামের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। একসময় আকাশ জুড়ে দেখা দিল আলোকছটা। এমন একটা সময় বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের পত্নী মোক্ষদা সুন্দরীর কোল আলো করে জন্ম নিলেন শিশুকন্যা নির্মলা। এই নির্মলা একদিন 'মা আনন্দময়ী' নামে সারা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে আলো ছড়ান।

পাঁচ বছরের নির্মলা একদিন বাবার কাছে জানতে চান, হরি নাম করলে কী হয়? বাবা বিপিনবিহারী বলেন, হরির নাম করলে হরিকে দেখা যায়, মা। মেয়ে আবার প্রশ্ন করে, হরি কি খুব বড়, বাবা? বাবা বলেন, হ্যাঁ গো, হরি যে খুব বড়। ছোট্ট নির্মলা বুঝে উঠতে পারে না, এই 'খুব বড়'টা কত বড়! শেষ পর্যন্ত সামনের মাঠটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এই মাঠের মতো বড়? হেসে ফেলেন বিপিনবিহারী। বলেন, এর চেয়ে অনেক অনেক বড়। তুই তাঁকে ডাকলেই জানতে পারবি তিনি কত বড়! বাবার কথা শুনে ছোট্ট মেয়েটি মনেপ্রাণে হরিকে ডাকতে থাকেন। হরিনাম কীর্তন তাঁকে আনন্দ দিল।

গ্রামের পাঠশালায় নির্মলার পড়াশোনা শুরু হলেও তা বেশিদূর এগোয়নি। চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে। রমণীমোহনকে তিনি ডাকতেন 'ভোলানাথ' নামে। পরে তিনি ওই নামেই পরিচিত হয়েছিলেন। ভোলানাথ বাজিতপুরে চাকরি করতেন। বিয়ের প্রায় দশ বছর পর নির্মলা স্বামীর কর্মস্থলে যান। সেখানে তাঁর মধ্যে ক্রমশই দিব্যভাব প্রকাশিত হতে থাকে। কোথাও কৃষ্ণনাম শুনলে তিনি আকুল হয়ে যান। একবার ভূদেবচন্দ্র বসুর বাড়িতে কীর্তন শুনতে শুনতে নির্মলা অজ্ঞান হয়ে যান। তখন তাঁর দেহ থেকে দিব্য

আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এভাবে নির্মলার মধ্যে মহাভাবের শুরু হয়। মা আনন্দময়ীর পুরো জীবন জুড়ে রয়েছে নানারকম অলৌকিক ঘটনার জনশ্রুতি।

১৯২৪ সালে ভোলানাথ নবাবের বাগানে চাকরি নিয়ে ঢাকার শাহবাগে চলে আসেন । সঙ্গে আসেন নির্মলাও। এই শাহবাগের কালী মন্দিরে নির্মলার মধ্যে মাতৃমূর্তি প্রকটিত হয়। নির্মলা নিজের যোগ-বিভূতির ঐশ্বর্যে হয়ে উঠলেন 'মা আনন্দময়ী'। এখানেই তাঁর সাধন-ভজন চলতে থাকে। ১৯২৬ সালে সিদ্ধেশ্বরীতে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। মা আনন্দময়ী মায়ের আদি আশ্রম এটি।

ঢাকার নবাবের মেয়ে প্যারীবানু মাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ১৯২৭ সালে তিনি নিজের পুত্র ও কন্যার বিয়েতে মা আনন্দময়ীকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানান। তিনি বিয়েতে আসেন। প্যারীবানুর বাড়িতে মায়ের কণ্ঠে কীর্তন শুনতে এসেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তীদেবী। আনন্দময়ী মায়ের সর্বাঙ্গে এক দিব্যভাব, মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় সুষমা। বাসন্তীদেবী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মা আনন্দময়ীর দিকে— আর কোনোদিকেই তাঁর লক্ষ্য নেই। পরে এর কারণ জানা গেল; চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে আনন্দময়ী মাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। স্বপ্নে মা তাকে জানিয়েছিলেন, বাসন্তীদেবীর ভয়ানক বিপদ আসছে। অথচ তখন অবধি তিনি মাকে চিনতেন না!

১৯৩২ সালে মা আনন্দময়ী স্বামীসহ চলে যান উত্তর ভারতের দেরাদুনে। দিব্যভাবের পরিচয় পেয়ে সেখানকার অনেকেই তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠেন। অনেক নগর, জনপদ, তীর্থ ভ্রমণ করে, অনেক মানুষকে কৃপা করে মা আনন্দময়ী আসেন হরিদ্বারে। দেরাদুনে যাওয়ার বছর পাঁচেক পরে, সেবার কুম্ভমেলায় যোগস্নানে ভক্তদের নিয়ে মা এসেছেন। উঠেছেন ভক্ত ডা. পীতাম্বর পন্থর বাড়িতে। গঙ্গাতীরে ডা.পন্থের বাড়িটাকেই মা 'আনন্দময়ী সেবাশ্রম' করে গড়ে তুলেছেন। এখানে আসার দুই একদিন পরেই মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকেরা মায়ের ক্যান্সার হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ফলে সকলেই উদ্বিগ্ন, দিশেহারা। সবাই ধরে নিলেন, মাকে এবার আর বাঁচানো যাবে না। একদিন মা ভক্ত অভয়কে নামকীর্তন করার নির্দেশ দিলেন। কীর্তনানন্দে সবাই ভেসে গেলেন, সেইসঙ্গে ভেসে গেল মায়ের রোগ-ব্যাধিও।

মা আনন্দময়ী

মা আনন্দময়ীর কাছে জগৎ নৃত্যময়। মাটিতে একটি বীজের যখন অঙ্কুরোদ্গম হয়, সেটা কিন্তু তখন নৃত্যের ভঙ্গিমায় বেড়ে ওঠে। গাছটি বেড়ে উঠতে উঠতে একটা সময় সেই মাটিতেই মিলিয়ে যায়। তাই তিনি বলছেন, এই তরঙ্গরূপ নৃত্য যা থেকে শুরু হয়, একসময়ে স্তিমিত হয়ে আবার তাতেই মিলে যায়। তাঁর এই ভাব মূলত জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সম্পর্কেরই রূপ। তাঁর মতে, ভগবানের খেলা, লীলা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সবই নৃত্যরূপে প্রকাশ। নৃত্যশিল্পী পন্ডিত উদয়শঙ্করও নৃত্য সম্পর্কে মায়ের বিশ্লেষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মা আনন্দময়ী বলতেন, "সংসারটা ভগবানের; যে যেই অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা থেকে কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া মানুষের কর্তব্য।" এটাই মায়ের মুখ্য বাণী।

মা আনন্দময়ীর আরও কিছু বাণী

- ভেতরে যেমন অজ্ঞানের পর্দা আছে, জ্ঞানের দরজাও আছে।
- পাথর দেখলে বিগ্রহ নেই আর বিগ্রহ দেখলে পাথর নেই।
- যিনি অখণ্ডরূপে প্রভু তিনিই খণ্ডরূপে দাস।
- ভগবানের রাজ্যে প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার যোগ, নিত্যযোগ।
- কর্ম করে কে? কর্মও তিনি করছেন, ফলও তিনি ভোগ করছেন।

মা আনন্দময়ী তৎকালীন ভারতবর্ষের জনগণকে ভগবদ্মুখী করার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি পুরো উপমহাদেশে অনেকবার ভ্রমণ করেছেন। তিনি অন্যান্য দেশেও গিয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মস্থল, সহস্র ঋষির তপোভূমি নৈমিষারণ্যকে তিনি জাগরিত করেন। এখন সেখানে কীর্তন, নাচ, গান, ধর্মগ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চলছে। এভাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানের ম্লান হয়ে ওঠা এবং হারিয়ে যাওয়া ধর্মস্থানকে জাগ্রত করেছেন। সেখানে যাগ-যজ্ঞ, মন্দির, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সনাতন ধর্মের ভাব-ধারায় একাত্ম করেছেন। বাংলাদেশের রমনা ও খেওড়ার দুটি আশ্রমসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর নামে প্রায় পঁচিশটি আশ্রম, বিদ্যাপীঠ, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মা আনন্দময়ীর সান্নিধ্যে এসেছেন দেশের অতি সাধারণ গ্রামবাসী থেকে শুরু করে ভারতের অনেক জ্ঞানী-গুণী। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এঁরা মায়ের সঙ্গে দেখাও করেছেন। তাঁর দেখা হয়েছে মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রোমেন রোল্যান্ডের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে। তিনি পরমহংস যোগানন্দ, রমণা মহর্ষি, স্বামী শিবানন্দ এবং মাদার তেরেসার মতো অন্যান্য আধ্যাত্মিক শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

মা আনন্দময়ী কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। সব মানুষই তাঁর স্নেহের পাত্র ছিল। তিনি সর্বজনীন প্রেম ও সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর সবকিছুর মধ্যে বিরাজমান। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হলো নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা। তিনি মানুষকে ধ্যান, প্রার্থনা, সেবা এবং আত্মানুসন্ধান করতে বলতেন। আনন্দময়ী স্বামী ভোলানাথ ছাড়া কাউকে দীক্ষা দেননি এবং নিজেও কারোর কাছে দীক্ষিত হননি। মা আনন্দময়ী সমাধিস্থ হয়ে বহু মন্ত্র বীজসমেত উচ্চারণ করতেন। সেই সমস্ত মন্ত্র লিখে রাখতেন ভোলানাথ। মা বলতেন, যখন কেউ দীক্ষা নিতে আসবে, তখন এই মন্ত্রই তাদের দেবে। তবে তিনি বলতেন, স্থূলভাবে দীক্ষার প্রয়োজন, সকলের জন্য সব না।

মা আনন্দময়ী ১৯৮২ সালের ২৭ আগস্ট দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে, নিজের বিদায়ক্ষণটি তিনি নিজেই স্থির করেন। তার সমাধি মন্দিরের অবস্থান উত্তর ভারতের হরিদ্বারে কনখল আশ্রমে গঙ্গার তীরে। প্রতি বছর হাজার হাজার তীর্থযাত্রী সেখানে যান। মায়ের শিক্ষা এবং উত্তরাধিকার, বিশ্বজুড়ে যারা জীবনে শান্তি, আনন্দ এবং জ্ঞানের সন্ধান করে তাদের অনুপ্রাণিত করে।

- চলো, আমরা প্রত্যেকে মা আনন্দময়ীর আরও কিছু বাণী খুঁজে বের করে পড়ি। নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সেগুলো নিয়ে আলাপ করি। তাদের কার কোন বাণীটি ভালো লেগেছে, কেন ভালো লেগেছে, শুনি। এবারে এককভাবে নিচের 'প্রিয় বাণী' ছকটি পূরণ করি।

ছক ৩.১৬: প্রিয় বাণী

মা আনন্দময়ীর বাণী	কার এবং কেন ভালো লেগেছে
১.	
২.	
৩.	

শ্রীলভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

১৮৯৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর, কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় মামার বাড়িতে জন্ম নেয় এক শিশু। মামা শিশুটির নাম রাখেন নন্দদুলাল। নন্দদুলালের বাবা গৌরমোহন দে আর মা রজনী দেবী। তাঁরা শিশুটির নাম রাখেন অভয়চরণ। তাঁদের বসবাস কলকাতার হ্যারিসন রোডে। অনেক পরে শিশুটির পুরো নাম হয়েছিল কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ শ্রীলভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস (ইস্কন)', বাংলায় যাকে বলে 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ'। তিনি ভক্তিযোগের শিক্ষা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শৈশবে অভয়চরণ সম্পর্কে জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'শিশুটির বয়স যখন ৭০ বছর হবে, তখন তিনি সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে যাবেন, এক বিখ্যাত ধর্মপ্রচারকরূপে স্বীকৃতি লাভ করবেন এবং ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।' এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় সবটাই তাঁর জীবনে সত্যে পরিণত হয়েছিল। কলকাতার ছেলে অভয়চরণ কেমন করে সারাবিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিলেন সে কাহিনি গল্পকেও হার মানায়।

গৌরমোহন দে ছিলেন একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব। তাঁর ইচ্ছে ছেলে অভয়চরণও তাঁর মতো বৈষ্ণব হোক । এজন্য তিনি ছেলেকে নিয়মিত রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে নিয়ে যেতেন। অভয়চরণের মা ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা। তাই তাঁর মধ্যেও বৈষ্ণবভাবের প্রকাশ ঘটেছিল। অভয়চরণ শৈশব থেকেই দেখতেন, মা কেমন সারল্যভরে সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন, পূজা-পার্বণ করেন– এই ভক্তি ও সারল্য বালক অভয়চরণের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

অভয় যতই বড় হচ্ছিলেন, ততই ভগবানের বিগ্রহের প্রতি ভক্তি বাড়ছিল। পাঁচ বছরের ছোট্ট অভয়কে বাবা তিন ফুট উঁচু একটা রথ বানিয়ে দেন। এরপর অভয়ের অনুরোধে বাবা তাঁকে রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ কিনে দেন। তখন থেকে নিজের খাবার আগে তিনি রাধা-গোবিন্দকে নিবেদন করতেন, তারপর প্রসাদ গ্রহণ করতেন। সেই পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকেই অভয় প্রতিদিন ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে সেই বিগ্রহের আরতি করতেন।

কলেজে পড়বার সময়ে বাইশ বছর বয়সে অভয়চরণের বিয়ে হয় রাধারাণী দত্তের সঙ্গে। তখন তিনি কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্রের স্নাতক শ্রেণির ছাত্র। সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছিল। তাঁরই কলেজে এক ক্লাস উপরে পড়তেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা অভয়চরণকে মুগ্ধ করে।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের প্রতিও অভয়চরণের আকর্ষণ ছিল। গান্ধীর চিন্তাজগৎ পুরোনো ভারতীয় সংস্কৃতির মূলনীতি-প্রভাবিত ছিল। তাঁর কথায় ছিল গীতার স্পষ্ট প্রভাব। অভয়চরণ গান্ধীর বক্তৃতা-বিবৃতি শুনতে এবং পাঠ করতে ভালোবাসতেন। ১৯২০ সালে অভয়চরণ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময় ইতঃপূর্বে সংঘটিত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে গান্ধীজী সম্পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ইংরেজদের সবকিছু বর্জনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অভয়চরণ তাঁর স্নাতক ডিগ্রি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর বাবা তখন ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে ওঠেন। তিনি বন্ধু কার্তিক চন্দ্র বসুর বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানিতে ছেলের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেন। অভয়চরণের চাকরিজীবন শুরু হয় বোস ল্যাবরেটরির ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে।

১৯২২ সালে অভয়চরণ বন্ধু নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুরোধে কলকাতার বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠে যান; এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে। সন্ন্যাসীর নাম শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী। সেদিন সন্ন্যাসী তাঁদের বললেন,

'তোমরা শিক্ষিত যুবক। তোমরা কেন সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছ না?' অভয় তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমরা একটি পরনির্ভর দেশের অধিবাসী, প্রথমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন হতে হবে। তা নাহলে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আপনি কীভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার করবেন?' সন্ন্যাসী উত্তর দিয়েছিলেন, 'কৃষ্ণভাবনামৃত ভারতীয় রাজনীতির পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে না।' যুবক অভয় সেই রাতেই শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। গুরু তাঁকে বলেন, 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নামকীর্তন সহজেই সকল শ্রেণির মানুষকে কাছে টানতে পারে। সংসারের সকল রকম দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে শান্তি দিতে পারে । কলিযুগে জীবোদ্ধারের এটাই একমাত্র পথ।'

শ্রীলভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পন্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘের) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। অভয়চরণ এগারো বছর ধরে গুরুর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯৩২ সালে অভয়চরণ চাকরিসূত্রে সপরিবারে এলাহাবাদ চলে যান। সেখানে তিনি চাকরির পাশাপাশি ব্যবসাও শুরু করেন। এর পরের বছর তিনি শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। গুরু তাঁকে বারবার বলেছেন, 'ইংরেজির ওপরে জোর দাও। অনুবাদে মন দাও, বই ছাপাও।' ইংরেজি বই ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তিনি সারা বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত বা চৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করতে চেয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে গুরুর দেহত্যাগের এক মাস আগে, নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে গুরুদেবের কাছে জানতে চেয়ে, অভয়চরণ একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির উত্তরে গুরু অভয়চরণকে বলেছিলেন, 'আমি নিশ্চিত যে, যারা বাংলা ও হিন্দি ভাষা জানে না, সেইসব মানুষের কাছে তুমি ইংরেজিতে আমাদের চিন্তা ও যুক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে। আশা করছি তুমি নিজেকে একজন সুদক্ষ ইংরেজি ধর্ম প্রচারকে পরিণত করবে।' এই কথার ভিত্তিতে অভয়চরণ নতুন করে কাজে নামেন। দুই-তিন বছরের মধ্যে অভয়চরণ বই লিখলেন 'ইনট্রোডাকশন টু গীতোপনিষদ'।

১৯৪৪ সালে অভয়চরণ ইংরেজি সাময়িকী 'ব্যাক টু গডহেড' প্রকাশনা শুরু করেন। তিনি নিজেই এটা সম্পাদনা করতেন, পাণ্ডুলিপি লিখতেন, প্রুফ যাচাই করতেন। এমনকি প্রতিটা কপি নিজেই বিতরণ করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত বিভক্তির সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়। সেসময়ে অভয়চরণ তাঁর পত্রিকায় গান্ধী-জিন্নাহর সাক্ষাৎকার নিবন্ধটিতে লিখেছিলেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষ স্বার্থপরতা এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনার দ্বারা প্রভাবিত থাকবে, ততদিন সাম্প্রদায়িক লড়াই চলবেই। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা এবং পারমার্থিক উপলব্ধির ভিত্তিতেই কেবল প্রকৃত ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব। সেবছরই তাঁর দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষের স্বীকৃতিরূপে ' গৌড়ীয়

বৈষ্ণব সমাজ' তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫০ সালে অভয়চরণ সংসারজীবন থেকে অবসর নিয়ে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি লেখা ও পড়ার কাজে আরও বেশি করে নিবেদিত হলেন। তিনি বৈদিক শাস্ত্র, বিশেষ করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যসহ অনেক বই লিখেছেন। তিনি নিজের পত্রিকা এবং বই তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত মনীষীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণান, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে তিনি দেখাও করেছেন। এঁরা তাঁর কাজের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

১৯৫৩ সালে তিনি ঝাঁসীতে নিজের প্রথম শিষ্যকে দীক্ষিত করেন। সেখানে তাঁর নিজস্ব কেন্দ্র ও ভক্তসংঘেরও শুভ উদ্বোধন হয়। কিন্তু থাকার জায়গা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাবে তিনি ঝাঁসী ত্যাগ করেন। তবে বিশ্বব্যাপী ভক্তসংঘ গড়ে তোলার পরিকল্পনাটি ত্যাগ করেননি। ১৯৫৪ সালে অভয়চরণ পরিবার পরিত্যাগ করে গুরুমহারাজের আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। এরপরে তাঁকে বিভিন্ন আশ্রয়ে নানারকম কষ্টভোগ করে দিন কাটাতে হয়েছে। তাঁর কাছে অর্থ ছিল না, বন্ধু-পরিবার ছিল না, তিনি ছিলেন একেবারে একা। তবুও তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁর গুরুমহারাজের স্বপ্নপূরণ। ১৯৫৬ সালে তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে চলে যান এবং জীবনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বিশদ প্রস্তুতি ও অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁর নাম হয় 'অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী'।

কৃষ্ণবলরাম মন্দির, বৃন্দাবন

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী ১৯৬৫ সালে প্রায় ৭০ বছর বয়সে জাহাজে চড়ে একা আমেরিকা যান। তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য জাহাজঘাটে কেউ ছিল না। অচেনা নতুন দেশেও তাঁর অপেক্ষায় কেউ ছিল না।

জাহাজ থেকে নেমে ডানে না বাঁয়ে যাবেন তাও জানতেন না। তাঁর সম্বল ছিল কেবল আটটি ডলার, কিছু শুকনো খাবার আর নিজের লেখা বেশকিছু বই। অথচ অনেক ঝড়-ঝাপটা পেরিয়েও প্রবল মনের জোর আর অটল বিশ্বাসে তিনি সেখানে টিকে রইলেন। প্রচার করলেন কৃষ্ণনাম। ক্রমশ তাঁর খ্যাতি আমেরিকা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকায় পৌঁছানোর এক বছর পরে তিনি নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠা করেন 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ' সংক্ষেপে 'ইস্কন' নামে পরিচিত। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে এমন অনেক আমেরিকান যুবক-যুবতীকে আকৃষ্ট করেছিলেন যারা বস্তুবাদী সংস্কৃতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে জীবনের আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজছিল। তিনি তাদের 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।'— এই মহা-মন্ত্র জপ করতে এবং শুদ্ধ জীবনযাপন করতে শিখিয়েছিলেন। তখন তিনি পরিচিত হন 'শ্রীলভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ' নামে। তাঁর কাছে কবি অ্যালেন গিনসবার্গও এসেছিলেন; ভক্তদের নিয়ে পথে পথে গেয়েছিলেন 'হরে কৃষ্ণ' মহানাম।

স্বামী প্রভুপাদ বিশ্বাস করতেন, সকল জাতির মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিতে পারলে কোনো জাতিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজ থেমে যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি মন্দির, আশ্রম, পল্লী-আশ্রম, বিদ্যালয়, রেঁস্তোরা এবং প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি চৌদ্দবার বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেন। অনেক বিশিষ্ট নেতা, পন্ডিত এবং বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন। বিটলস্ তারকা জর্জ হ্যারিসনসহ বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি তার আদর্শের অনুসারী হন। শতাধিক মন্দির, আশ্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কৃষ্ণকেন্দ্রের সমন্বয়ে ইস্কনকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বর্তমান বিশ্বের অন্তত একশটি দেশে ইস্কনের সাতশরও বেশি মন্দির আছে। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার মায়াপুরে ইস্কনের প্রধান মন্দিরের অবস্থান। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি জেলা শহরে ইস্কনের মন্দির আছে।

শ্রীল প্রভুপাদের লেখা বইগুলো যেমন জ্ঞানীর পাঠ্য তেমনি সাধারণ মানুষেরও। বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেগুলো পাঠ্য। বৈদিক দর্শনের এই সমস্ত বই প্রকাশ করছে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট'। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চারটি খন্ড তাৎপর্যসহ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ভা-ষ্যসহ আঠারো হাজার শ্লোকের ইংরেজি অনুবাদও করেন, যা আঠারোটি খন্ডে প্রকাশিত। বৈদিক সংস্কৃতি ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে সত্তরটিরও বেশি বই অনুবাদ করেছেন ও লিখেছেন। এই বইগুলো আশিটির বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন হয়। আজ পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা হাজারেরও বেশি।

১৯৭৭ সালের ১৪ নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইহলীলা সংবরণ করেন। সেখানকার কৃষ্ণবলরাম মন্দিরে তিনি সমাধিস্থ আছেন।

- কলকাতার অভয়চরণ কেমন করে সারাবিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিলেন সে কাহিনি গল্পকেও হার মানায়। তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি ঘটনার ছবি এঁকে এবং ছবির নিচে ক্যাপশন লিখে আমরা প্রত্যেকে 'জীবন-সাধনা' ঘরে প্রকাশ করি।

ছক ৩.১৭: জীবন-সাধনা

সাধক রামপ্রসাদ

আঠারো শতকের বাঙালি গীতিকবি রামপ্রসাদ সেন, যাঁর গান পরবর্তী সময়ে কমলাকান্ত, লালন, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত— সকলকেই প্রভাবিত করেছে। তিনি ছিলেন মাতৃসাধক। তাই তাঁকে আমরা সাধক রামপ্রসাদ বলেই চিনি। মা কালীর প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, ভরসা, অভিমানে তিনি কালীকে নিজের মা, মেয়ে, বন্ধু এবং গুরু হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি শ্যামাসংগীতের মাধ্যমে কালীর সাথে আবেগ, হাস্যরস, বিদ্রূপ এবং প্রজ্ঞায় পূর্ণ এক গভীর সম্পর্ক প্রকাশ করেছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ মা কালীকে ব্রহ্মজ্ঞানে আরাধনা করতেন। আবার একইসঙ্গে নিজের ঘরের মেয়ে বলেও ভাবতেন। গানে গানে সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন—

আমার অন্তরে আনন্দময়ী
সদা করিতেছেন কেলি,

আমি যেভাবে-সেভাবে থাকি

নামটি কভু নাহি ভুলি।

আনুমানিক ১৭২০ সালে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীরে হালিশহর গ্রামের সর্বেশ্বরী দেবীর কোলে আসেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর বাবা রামরাম সেন। তিনি ছিলেন আয়ুর্বেদিক ঔষধ ব্যবসায়ী। রামপ্রসাদের লেখা আত্মপরিচয় থেকে বোঝা যায়, রামরাম সেনেরও কাব্য-প্রতিভা ছিল। রামপ্রসাদ শৈশব থেকেই নিজের মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। পাঠশালার পাঠ শেষ করে পারিবারিক ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি সংস্কৃত ভাষা শেখেন। কিন্তু ব্যবসার প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। সাহিত্য ও সংগীত তাঁকে প্রবলভাবে টানত। তাই রামরাম সেন ছেলেকে ফারসি ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করেন। এভাবে রামপ্রসাদ ষোলো বছর বয়সের মধ্যেই সংস্কৃত, বাংলা, ফারসি, হিন্দি ইত্যাদি ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁর সাহিত্য ও সংগীত চর্চার পথ প্রসারিত হয়। এ বয়সেই তাঁর মধ্যকার অসাধারণ কবিত্ব শক্তি প্রকাশিত হয়।

সংসারের প্রতি তাঁর একেবারেই মন ছিল না। এই দেখে বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাই সমস্যার সমাধান হিসেবে তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হলো। কনে ছিলেন শর্বাণী দেবী। কিন্তু বিয়ের পরও সংসারের প্রতি রামপ্রসাদের কোনো আগ্রহ তৈরি হলো না। বরং মাতৃসাধনায় মনোযোগ আরও বাড়ল। বয়স তখন সতেরো কী আঠারো, এমন সময়ে রামপ্রসাদের জীবনে নেমে এল ঘোরতর দুর্যোগ; বাবা রামরাম সেন মারা গেলেন। ফলে সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপরে এসে পড়ে। তাই অর্থ উপার্জনের জন্য রামপ্রসাদকে কলকাতায় যেতে হয়।

সাধক রামপ্রসাদ

কলকাতার ম্যানহাটের জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র। রামপ্রসাদ তাঁর সেরেস্তায় মুহুরির পদে কাজ নেন। মুহুরির কাজ খাতায় হিসাব লিখে রাখা। কিন্তু কালীভক্ত রামপ্রসাদ হিসাবের খাতা শ্যামাসংগীত লিখে ভরে ফেললেন। জমিদারের কানে খবর গেল। তিনি খাতাসহ রামপ্রসাদকে ডেকে পাঠালেন। রামপ্রসাদের মনে ভয়, চাকরি বুঝি আর থাকে না! কিন্তু ঘটনা ঘটল উল্টোরকম। জমিদারবাবু রামপ্রসাদের রচনা পড়ে মুগ্ধ হলেন। বললেন, হিসাব করার জন্য তোমার জন্ম হয়নি। আরো বড় কাজের জন্য তোমার জন্ম। বাড়ি ফিরে যাও, মায়ের সাধনা করো আর শ্যামাসংগীত রচনা করো। রামপ্রসাদের বেতন ছিল ত্রিশ টাকা। দুর্গাচরণ এই টাকাটা রামপ্রসাদের মাসিক বৃত্তি হিসেবে বরাদ্দ করলেন। রামপ্রসাদ ফিরে এলেন নিজ গ্রাম হালিশহরে। জমিদারের বরাদ্দের টাকায় সংসার কোনোমতে চলছিল। আর রামপ্রসাদ একমনে মায়ের ভজনা আর সংগীতের সাধনা করে চললেন।

রামপ্রসাদ গঙ্গার ঘাটে বসে আপন মনে স্বরচিত গান গাইতেন। তাঁর সুমধুর গান শুনে নৌকার মাঝিদের দাঁড় থেমে যেত। যাত্রীরা যাত্রা থামিয়ে ভক্তিভরে রামপ্রসাদী গান শুনতেন। কথিত আছে, একদিন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা গঙ্গার ওপর দিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় যাবার সময়ে রামপ্রসাদের গান শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে বজরায় ডেকে এনে মন ভরে গান শোনেন।

ধীরে ধীরে সাধক রামপ্রসাদের মাতৃসাধনা ও শ্যামাসংগীতের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন নবদ্বীপের রাজা ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তিনি রামপ্রসাদের খ্যাতির কথা শুনে তাঁকে রাজসভায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু সাধক রামপ্রসাদ, যিনি গানে গানে কালী মাকে জানিয়েছেন, 'চাই না মাগো রাজা হতে—'; তিনি মহারাজের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তবুও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের সাধনা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একশত বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। মহারাজের অনুরোধে রামপ্রসাদ রচনা করেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তিনি এই কাব্য পড়ে মুগ্ধ হন এবং তাঁর প্রস্তাবে মহারাজ রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

- প্রত্যেকে কয়েকটি রামপ্রসাদী গান শুনে নিজের পছন্দের গানটি 'রামপ্রসাদী গান' ছকে লিখে রাখি। গানটি গাইবারও চেষ্টা করি।

ছক ৩.১৮: আমার পছন্দের রামপ্রসাদী গান

রামপ্রসাদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল শ্যামা মা। সারাক্ষণ কেবল মায়ের কথাই ভাবতেন। তিনি কাজ করতে করতেও মুখে শ্যামা মায়ের নাম নিতেন। কন্যারূপে মা কালী রামপ্রসাদের কাছে ধরা দিয়েছিলেন— এরকম অলৌকিক ঘটনাও প্রচলিত আছে। ঘটনাটি হলো, একদিন রামপ্রসাদ ঘরের বেড়া বাঁধছিলেন। বেড়ার উল্টোদিক থেকে মেয়ে জগদীশ্বরী বেড়া বাঁধবার দড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে বাবাকে সাহায্য করছিল। এক সময়ে ছোট্ট মেয়ে জগদীশ্বরী বাবাকে কিছু না বলে খেলতে চলে যায়। তখন মা শ্যামা জগদীশ্বরীর রূপ ধরে এসে রামপ্রসাদকে কাজে সাহায্য করেন। অনেকক্ষণ পরে জগদীশ্বরী এসে দেখে বাবার বেড়া বাঁধা হয়ে গেছে। তার কথায় বাবা রামপ্রসাদ জানলেন, মেয়ে এতক্ষণ এখানে ছিল না। তখন রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, শ্যামা মা-ই জগদীশ্বরী-রূপে এসেছিলেন। রামপ্রসাদ তখন আকুল হয়ে 'মা মা' বলে ডাকতে লাগলেন। ভক্তিভাবে তাঁর দুচোখ বেয়ে জলধারা নামল। এরপর রামপ্রসাদের সাধনা আরও গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। রাতদিন শুধু মা-ই ধ্যান-জ্ঞান। এই একনিষ্ঠ সাধনায় তুষ্ট হয়ে একদিন মা নিজরূপে দেখা দিলেন। চারদিক আলোকিত করে তিনি রামপ্রসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সাধক রামপ্রসাদ মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলেন। সিদ্ধ হলো তাঁর সাধনা। এরপর তিনি প্রায়শই ভাব-সমাধিস্থ হতেন এবং মা কালীর দর্শন লাভ করতেন। রামপ্রসাদের আশীর্বাদে অলৌকিকভাবে বহু মানুষ রোগমুক্ত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। মাতৃরূপে শক্তিসাধনার যে নতুন ধারা রামপ্রসাদ প্রবর্তন করেছেন তা-ই পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা প্রমুখ সাধককে অনুপ্রাণিত করেছে।

রামপ্রসাদ রাগ ও বাউল সুরের মিশ্রণে এক ভিন্ন ধারার সুর সৃষ্টি করেন, যা 'রামপ্রসাদী সুর' নামে পরিচিত। বাস্তব জীবনে কর্মযোগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার এক অপূর্ব মিলনের চিত্র আমরা রামপ্রসাদের জীবন ও সংগীতে খুঁজে পাই। অন্তরে বৈরাগ্য নিয়েও রামপ্রসাদ গৃহী ছিলেন। সংসারের দায়িত্ব-কর্তব্য মাথা পেতে নিয়েছিলেন। জীবনের দুঃখ-কষ্টকে গৌরব মনে করে গানের মধ্য দিয়ে বলেছেন, 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই'। তাঁর রচিত গানের বেশিরভাগই হারিয়ে গিয়েছে। যা খুঁজে পাওয়া যায় তার সংখ্যাও খুব কম নয়। তাঁর কিছু জনপ্রিয় গান— মন রে কৃষি কাজ জানো না, ডুব দেরে মন কালী বলে, মা আমায় ঘুরাবি কত ইত্যাদি। দুর্গাপূজার সময়ে যে আগমনী গান শোনা যায়, সেই গানের ধারাটিরও প্রবর্তক রামপ্রসাদ। এছাড়া রামপ্রসাদ কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন, শিবকীর্তন, সীতাবিলাপ, নৌকাখণ্ডের সংগীত নামে বিভিন্ন জনপ্রিয় পালা রচনা করেছেন। রামপ্রসাদের অনেক গান আজও ভক্ত এবং সংগীতপ্রেমীদের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর রচনা বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের ধ্রুপদী সম্পদ বলে বিবেচিত।

রামপ্রসাদের সময়ে ভারতীয় সমাজ নানা বিপর্যয় এবং পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল— ১৭৩৯-এর মহাপ্লাবন, ১৭৪২ এবং ১৭৫২ সালের বর্গী হানা, ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ আর ১৭৬৯-এর মন্বন্তর। এসবের ভয়াবহ প্রভাব পড়েছিল বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর। এসব ঘটনা প্রবাহের প্রভাব রামপ্রসাদের গানে রয়েছে। ফলে এই গানগুলোর ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বও অনেক। সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন রামপ্রসাদ। সতীদাহ প্রথা রদ হওয়ার বহু আগে রামপ্রসাদ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, 'নহে শাস্ত্রশাম্যতা সহমৃতা।'

আনুমানিক ১৭৮১ সালে রামপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুঘটনা সম্পর্কে লোককথা এই যে, কালীপূজা শেষে প্রতিমা বিসর্জনের সময় 'তিলেক দাঁড়াওরে শমন' গানটি গাইতে গাইতে তিনি প্রতিমার সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন।

সারদা দেবী

উনিশ শতকের সাধিকা সারদা দেবীর মধ্যে ভক্তরা করুণা, বিশুদ্ধতা এবং প্রজ্ঞার মূর্ত রূপ দেখেছিলেন। তারা সারদা দেবীর মাতৃসুলভ গুণটি অনুভব করতে পারতেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামের দম্পতি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবী। ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর তাঁদের এক কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। বাবা কন্যাটির নাম রাখেন ঠাকুরমণি দেবী। আর মা রাখেন ক্ষেমাঙ্করী। পরে শিশুটির নাম হয় 'সারদামণি'। এই সারদামণিই কালক্রমে সারদা দেবী ও শ্রীমা হিসেবে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। কথিত আছে, সারদা দেবীর জন্মের পূর্বে রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরী দিব্যদর্শনে মহাশক্তিকে তাঁদের কন্যারূপে জন্ম নিতে দেখেছিলেন ।

সারদা দেবী

সারদা দেবীর শৈশব বেশ অনটনে কেটেছে। পিতা রামচন্দ্রের সামান্য জমির ফসল আর পৌরোহিত্যের আয় দিয়ে কোনোরকমে সংসার চলত। ছোট্ট সারদামণি ঘরের কাজকর্ম করতেন। ছোট ভাইদের দেখাশোনা করতেন। গবাদিপশুর যত্ন নেয়া থেকে শুরু করে ক্ষেতের ধান কুড়ানোর কাজও তাঁকে করতে হতো। সেকালের সাধারণ ঘরের মেয়েদের মতো সারদা দেবীও লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তবে তিনি নিজের উৎসাহে ভাইদের সঙ্গে কিছুদিন গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা করেছেন। এভাবে কিছুটা পড়তে শেখা হলেও লেখা শেখা হয়নি। তবে কথক ঠাকুরদের কথা, যাত্রাপালা, কীর্তন শুনে শুনে তিনি নানা বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছিলেন। বেশকিছু পৌরাণিক আখ্যান ও শ্লোকও আত্মস্থ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে সারদা দেবী স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইয়ের মেয়ে লক্ষ্মীদেবীর কাছে কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন।

শৈশবে লক্ষ্মী ও কালীর মূর্তি গড়ে খেলার ছলে পূজা করতেন সারদা দেবী। ছোটবেলা থেকেই মহামায়ার ধ্যান করতেন। সেই সময়ে তাঁর বিবিধ দিব্যদর্শন ও অভিজ্ঞতার কথা শোনা যায়।

সেকালের রীতি অনুযায়ী শৈশবেই সারদা দেবীর বিয়ে হয় গদাধরের সঙ্গে। গদাধরের বাড়ি ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে। এই গদাধরই পরে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলে খ্যাত হন। বিয়ের বছর দেড়েক পরে শ্রীরামকৃষ্ণ চলে আসেন কলকাতার দক্ষিণেশ্বরে। সারদা দেবী চলে যান নিজের বাবার বাড়িতে। প্রায় দুই বছর পর জয়রামবাটীতে তাঁদের আবার দেখা হয়। সেখানে কিছুদিন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। এরপর দীর্ঘ সাত বছর পর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মভূমি কামারপুকুরে যান। সারদা

দেবীও সেখানে আসেন। এ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে জীবনের কর্তব্য ও ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক উপদেশ দেন। তিনি বলেন, 'ঈশ্বর সকলেরই অতি আপনার। যে তাঁকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে, ডাকে, সেই তাঁর দেখা পায়। তুমি যদি ডাক, তুমিও তাঁর দেখা পাবে। তাঁর দেখা পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য।' তখন থেকেই সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপদেশ পান। স্বামীর এই উপদেশ সারদা দেবীর হৃদয়কে স্পর্শ করে। তিনি একে মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে সাধনার পথে যাত্রা শুরু করেন।

সাত মাস কামারপুকুরে কাটিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। আর সারদা দেবী বাবার বাড়িতে চলে যান। তারপর দীর্ঘদিন কেটে যায়। একসময়ে সারদা দেবী শুনলেন যে তাঁর স্বামী পাগল হয়ে গেছেন। আবার শুনলেন তিনি বিরাট সাধক হয়ে উঠেছেন। স্বামীর জন্য সারদা দেবীর উদ্বেগ বাড়তে থাকে। তিনি বাবার সঙ্গে ১৮৭২ সালে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হন। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কলকাতায় গঙ্গাস্নান উৎসব হবে। এই উৎসবকে সামনে রেখেই তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। অনেক কষ্ট করে পায়ে হেঁটে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান। পথে সারদা দেবী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। লোকশ্রুতি আছে যে, সেই সময়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণা এক নারীর রূপে মা কালী দিব্যদর্শন দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তোলার আশ্বাস দেন। দক্ষিণেশ্বরে আসার পর সারদা দেবীর সকল সন্দেহের অবসান ঘটে। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতই এক মহান আধ্যাত্মিক গুরু। সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দেন। তিনি চেষ্টা করতেন যাতে স্বামীর সাধনায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। তিনি নিজেও রামকৃষ্ণের উপদেশ মতো কঠোর সাধনা শুরু করেন। ভক্তিতে বিশ্বাসে সাধন-ভজনে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে ওঠেন। সারদা দেবীকে সকলে খুব শ্রদ্ধা করত। এক সময়ে সকলের কাছে তাঁর নতুন পরিচয় হয় 'শ্রীমা' বলে। শ্রীরামকৃষ্ণও স্ত্রীকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। মনে করা হয়, সারদা দেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্য। তিনি সারদা দেবীকে মন্ত্রশিক্ষা দেন। মানুষকে দীক্ষিত করে আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করার শিক্ষাও প্রদান করেন।

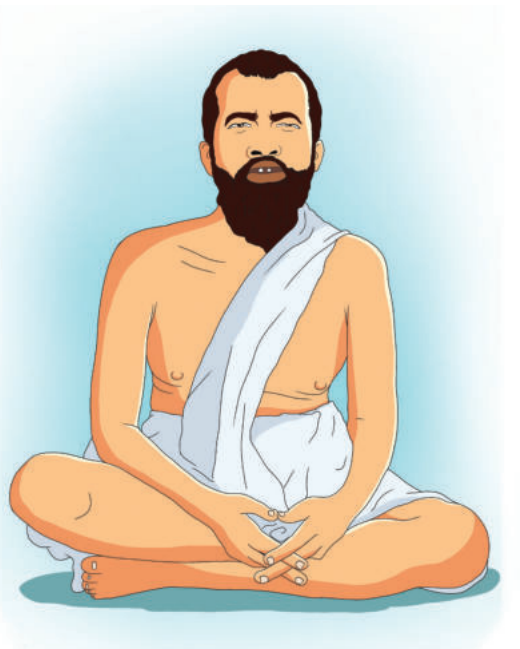

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

১৮৮৬ সালের ১৫ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। শ্রীমা তখন একেবারে একা হয়ে যান। যদিও ভক্তরা সবসময় তাঁকে ঘিরে রাখত। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের দুই সপ্তাহ পর শিষ্যদের নিয়ে সারদা দেবী উত্তর ভারতে তীর্থ ভ্রমণে যান। অযোধ্যা, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ও কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন দর্শন করেন। এই বৃন্দাবনেই সারদা দেবী নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। এখান থেকে গুরুমাতা হিসেবে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়। সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের তিনি মন্ত্রদীক্ষা দেন। কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর সারদা দেবী দিব্যদর্শন লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি মারা যাননি, কেবল এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

তীর্থযাত্রা শেষে সারদা দেবী কিছুদিন কামারপুকুরে একাকী অনেক দুঃখ-কষ্টে কাটান। ১৮৮৮ সালে শিষ্যরা

মা সারদাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে কলকাতার বাগবাজারে তাঁর জন্য স্থায়ী বাসভবনও তৈরি করা হয়। এটি 'মায়ের বাটী' নামে পরিচিত হয়েছিল। প্রতিদিন অগণিত ভক্ত মায়ের দর্শন, উপদেশ ও দীক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সেখানে আসতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে মা সারদা 'রামকৃষ্ণ আন্দোলন' চালিয়ে নিয়ে যান। কথিত আছে, কয়েকজন শিষ্য মায়ের দর্শন লাভের পর আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনুভব করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁর সাক্ষাৎ লাভের পূর্বেই দেবী রূপে তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ স্বপ্নেও তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিল। এঁদের মধ্যে অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

সারদা দেবীর জীবন নিঃস্বার্থ সেবা, ত্যাগ ও সম্প্রীতির বড় উদাহরণ। তিনি সমস্ত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সম্মান করতেন। সকলের সঙ্গে মায়ের মতো আচরণ করতেন। তিনি ছিলেন উদারমনা। তাঁর মধ্যে কোনো ধরনের কুসংস্কার, বৈষম্যের বোধ ছিল না। জাতপাতেরও কোনো ভেদাভেদ ছিল না। একদিন বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে পাঠিয়েছেন সারদা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। একজন শিষ্য সারদা দেবীর কাছে জানতে চাইলেন, তিনি এই মেমসাহেবার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা। উত্তরে সারদা দেবী বললেন, 'নরেন একটি শ্বেতপদ্ম পাঠিয়েছে। তা কি আমি না নিয়ে পারি?'

স্বামী বিবেকানন্দ সারদা দেবীকে জীবন্ত দুর্গা বলে অভিহিত করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁকে 'সংঘ জননী' বলে জানতেন। কুসংস্কার ও শিক্ষার অভাবে বিভ্রান্ত ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ পুরো ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তখন সারদা দেবীই ছিলেন তাঁর একমাত্র প্রেরণা। যেভাবে ভক্তরা তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন, ঠিক তেমনিভাবে সারদা দেবীও মমতাময়ী মায়ের মতো সকলের দেখাশোনা করতেন। সকলের মঙ্গল কামনা করতেন।

১৯১৯ সালের শুরুতে মা সারদা জয়রামবাটীতে থাকতে শুরু করেন। মাসকয়েক কাটানোর পর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এরপরও বেশ কয়েকমাস অসহনীয় রোগযন্ত্রণা ভোগ করার পর ১৯২০ সালের ২১ জুলাই কলকাতার উদ্বোধন ভবনে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে গঙ্গার তীরে তাঁর শেষকৃত্য হয়। এখানে গড়ে উঠেছে সারদা দেবীর সমাধি-মন্দির।

যেসব জায়গায় তিনি থাকতেন বা পরিদর্শন করেছিলেন সেসব জায়গায় তাঁর দেহাবশেষ ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সংরক্ষিত আছে। সারদা দেবীর কথা ও কাজ নিয়ে বিভিন্ন বই লেখা হয়েছে। তাঁর প্রভাব ও অনুপ্রেরণা মুক্তিকামী লক্ষ লক্ষ ভক্তকে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখায়।

মহাসমাধির আগে সারদা দেবীর শেষ কথা সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, 'শ্রীমায়ের দেহ ত্যাগের মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে এক ভক্ত অন্নপূর্ণা মাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ভেতরে যাইতে নিষেধ বলিয়া ঠাকুরঘরের বাইরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ পাশ ফিরিয়া মা তাহাকে দেখিয়া ইশারা করে নিকটে ডাকিলেন। তিনি কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলেছিলেন, মা, আমাদের কী হবে? করুণাবিগলিত ক্ষীণকণ্ঠে অভয় দিয়া মা আস্তে আস্তে বলিয়াছিলেন, ভয় কী? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কী? তবে একটি কথা বলি, যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।' ভক্তদের প্রতি এই ছিল সারদা মায়ের শেষ বাণী।

সারদা দেবীর আরও কয়েকটি উপদেশ:

- পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর ওপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, পৃথিবী অবাধে সব সইছে মানুষেরও সেই রকম চাই।
- কত সৌভাগ্য এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়।
- ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কী করে যে তাকে ভালো করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে?
- কাজ করা চাই বইকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।
- মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কি কথা বলতে আছে? কথা সত্য হলেও অপ্রিয় করে বলতে নেই। শেষে ওইরূপ স্বভাব হয়ে যায়। মানুষের চক্ষুলজ্জা ভেঙে গেলে আর মুখে কিছু আটকায় না।

সারদা দেবীর উপদেশগুলো নিজের ভেতরে লালন করতে হয়; আচরণে পালন করতে হয়। পাঠ্যবইয়ের বাইরের উৎস থেকে প্রত্যেকে তাঁর উপদেশগুলো খুঁজে বের করি। নিজের পছন্দের দুটি উপদেশ সম্পর্কে 'অনুসরণীয়' ছকে লিখি।

ছক ৩.১৯: অনুসরণীয়

আমি লালন করতে চাই:
আমি পালন করতে চাই:

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

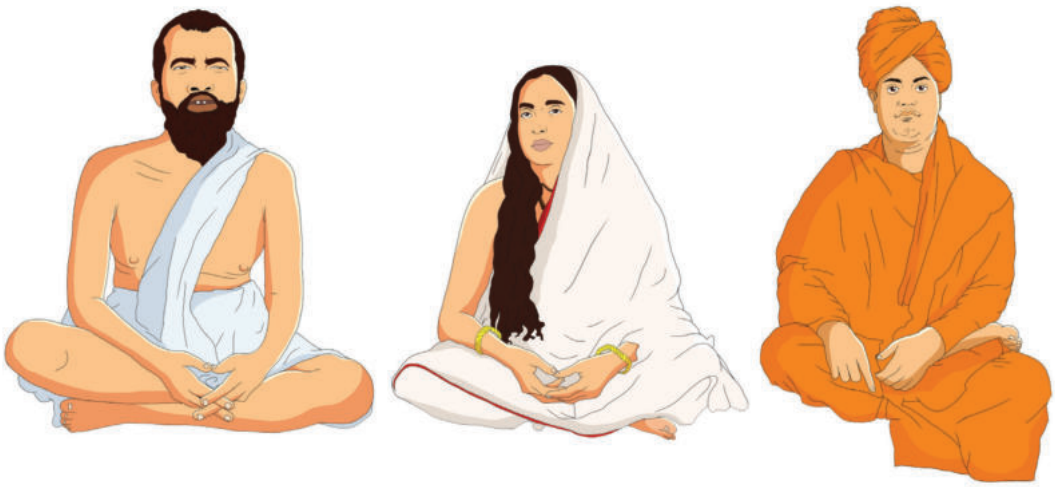

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে বলেন, 'তুই আমায় কাঁধে করে যেখানেই নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব এবং থাকব।' গুরুর মৃত্যুর পর স্বামীজী তাঁর দেহাবশেষের অস্থিকলসটি গঙ্গা নদীর উপকূলে বেলুড়ে প্রতিষ্ঠা করেন। সে জায়গাটি এখন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র। বেলুড়ের এই মঠ ও মিশনকে সংক্ষেপে বেলুড় মঠও বলা হয়। বেলুড় মঠ একটি পুণ্যতীর্থক্ষেত্র। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থল হবে।'

সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের জীবনের শেষ দিনগুলোও এখানেই কাটিয়েছেন। তাঁরা এখানেই সমাধিস্থ আছেন। এখানে আগত অতিথিদের থাকার জন্য অতিথি-ভবন আছে। সেইসাথে প্রতিদিন আগত অতিথিদের জন্য প্রসাদ ভোজনের ব্যবস্থাও রয়েছে। কেবল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্যই নয়, সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্যও বেলুড় মঠের দ্বার উন্মুক্ত।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কথা জানতে গেলে দুজন মহামানব ও একজন মহীয়সী নারীর কথা আগে জেনে নিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আবির্ভূত হন। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণিদেবী।

কৈশোরের শুরুতে তিনি কলকাতায় আসেন। তিনি রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সেবায়েত হন। তাঁর

দিব্য সাধনলীলায় এই মন্দির হয়ে ওঠে মহাতীর্থ। ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট তাঁর দেহাবসান হয়।

তাঁর সাধনার লক্ষ্য ছিল সর্বধর্মের, সর্বমতের মিলন ও সমন্বয়। তিনি নিজে সকল ধর্মাচরণ করে মত দিয়েছিলেন, 'যত মত তত পথ'। তিনি ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা ও ত্যাগের উপদেশ দেন। এর মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বীজ বপন করেন তিনি। তাই অঙ্কুরিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াসে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই মঠ ও মিশনের ইষ্টদেবতা।

রামকৃষ্ণ 'সর্বজীবে দয়া' কথাটি বলেই আবার সংশোধন করে বলেছিলেন, 'না, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যদি কোনোদিন সুযোগ পান, তবে গুরুর এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞাই বাস্তবরূপ পেল। বিবেকানন্দর প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল, 'তোর ছায়ায় যেন হাজার হাজার লোক আশ্রয় পায়'। পরবর্তীতে তাই হয়েছিল।

সারদা দেবী

ভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন তখন তাঁর শক্তি নারীরূপে তাঁর সহগামিনী হন। রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতা, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধা, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া, তেমনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদা দেবী। ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামাসুন্দরী দেবীর কন্যারূপে শ্রীমা আবির্ভূত হন। ভাগ্যবান ভক্তরা শ্রীমায়ের মধ্যে যে যার ইষ্টদেবী দুর্গা-কালী-লক্ষ্মী-জগদ্ধাত্রী-সীতা-রাধা-মেরির দর্শন পেতেন। শ্রীমা সারদা দেবী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধিষ্ঠাত্রী।

স্বামী বিবেকানন্দ

উত্তর কলকাতায় বিশ্বনাথ দত্ত এবং ভুবনেশ্বরী দেবীর কোলে ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি জন্ম নেয় এক পুত্র সন্তান। যার নাম রাখা হয় নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তার সুন্দর চেহারা, সংগীত-নৃত্য-বাদ্যে পারদর্শিতা, সাহস, ঔদার্য, সত্যনিষ্ঠা শৈশব থেকেই সকলকে মুগ্ধ করেছে। রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তারপর তাঁর নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে বলা হয় স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের অবতার।

তিনি গুরুদেব রামকৃষ্ণের প্রভাবে সমস্ত ভোগসুখ ত্যাগ করে মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেন। পরিব্রাজক হয়ে পুরো ভারতবর্ষ ঘুরে ভারতের দুঃখ-দুর্দশার কারণ অনুভব করেন। এরপর ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসভায় বক্তব্য দিয়ে উপস্থিত সকলকে অভিভূত করেন। এরপর তিনি পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের বেদান্তবাণী এবং শ্রীঠাকুরের আদর্শ ও সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তিনি পরলোকে গমন করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

১৮৬৮ সালের ২৭ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর সঙ্গে বৈদ্যনাথধাম-দেওঘরে উপস্থিত হলেন। সেখানকার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দুর্দশা দেখে মথুরবাবুকে এই মানুষগুলোকে সাহায্য করার অনুরোধ করলেন। মথুরবাবু জানালেন, এদের সাহায্য করতে গেলে তীর্থভ্রমণের খরচে টান পড়বে। ঠাকুর তখন বললেন,"দূর, তোর কাশী

আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।" তখন মথুরবাবু রামকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের সেবা করলেন। সেদিন অচল শিবদর্শনের চেয়ে সচল শিব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের লক্ষ্য 'মানুষের সেবা' হিসেবে সেদিনই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর গুরুর ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসী-সংঘ গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৭ সালের ১ মে স্বামীজী ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের একত্রিত করে 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য ও কার্যাবলি হলো:

- সকল ধর্মকে একই সনাতন ধর্মের বিকাশ মনে করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা।
- উন্নত চরিত্রের কর্মী তৈরি করা, যারা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে, জনসাধারণের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানকল্পে আত্মোৎসর্গ করবে।
- দেশের শিল্প, সাহিত্য এবং ললিতকলার উন্নতি ও বিস্তার সাধন করা
- শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের সর্বজনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মের প্রকৃত আদর্শ প্রচার করা।
- জাতি-ধর্ম নির্বিচারে নরনারায়ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

- 'আমার মত' ছকের বক্তব্যগুলোর সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে সহমত কিনা জানাই এবং মতামতের ব্যাখ্যা দেই।

ছক ৩.২০: আমার মত

বক্তব্য	সহমত	সহমত নই
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একজন সমাজসংস্কারক।		
মতামতের ব্যাখ্যা:		

ছক ৩.২১: আমার মত

হিন্দুধর্ম অনেক প্রাচীন ধর্ম	সহমত	সহমত নই

মতামতের ব্যাখ্যা:

রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য কাজ করে।	সহমত	সহমত নই
মতামতের ব্যাখ্যা:		

কলকাতার বেলুড় মঠ

এরপর ১৮৯৯ সালে 'রামকৃষ্ণ মিশন' বর্তমান বেলুড় মঠে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০১ সালে রামকৃষ্ণ মঠের রেজিস্ট্রেশন হয় আর ১৯০৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের রেজিস্ট্রেশন হয়। উভয়ের প্রধান কার্যালয় এই বেলুর মঠ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন হলো রামকৃষ্ণ সংঘের দুটো দিক। মিশন শিবজ্ঞানে জীবসেবা— এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জনসেবামূলক কাজ পরিচালনা করে। মঠ পূজা ও দীক্ষার আয়োজন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

মতবাদের প্রচার-প্রসার এবং মহামানবদের শ্রদ্ধা জানানোর কাজ করে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-বাক্য যোগ সাধনার এই চার পদ্ধতির সমন্বয় ঘটেছিল রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে। তাই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের এই আদর্শ-কে সিলমোহরে অঙ্কিত করে তার ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে, জলের ঢেউগুলো কর্মের, পদ্মফুল ভক্তির, উদী-য়মান সূর্যটি জ্ঞানের, পুরো ছবিকে জড়িয়ে ধরা সাপটি যোগ ও কুণ্ডলিনী শক্তির এবং রাজহাঁসটি পরমাত্মার প্রতীক।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য হলো, 'আত্মনো মোক্ষার্থম্ জগদ্ধিতায় চ'— নিজের মুক্তি ও জগতের হি-তসাধন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপ

রামকৃষ্ণ সংঘের ভারতে ১৫৭টি এবং ভারতের বাইরে ৫১টি রেজিস্ট্রিকৃত কেন্দ্র আছে। সবগুলো কেন্দ্রের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বেলুর মঠ। এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে এবং স্বামীজীর পথনির্দেশে নানান রকম আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হয়। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী এই সংঘের রয়েছে ১৪টি হাসপাতাল, ১১১টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ৫৬টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়, ৩৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৩টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৮১টি অন্যান্য বিদ্যালয়, ১২টি মহাবিদ্যালয়, ১টি বিশ্ব-বিদ্যালয়, ১৩৭টি ব্যক্তিগত শিক্ষাকেন্দ্র, ৭৮টি নৈশ (/প্রাপ্তবয়স্ক) বিদ্যালয়, ২টি ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র, ১টি বৈদিক শিক্ষাকেন্দ্র, ৪টি শিল্প বিদ্যালয়, ৭টি কুটিরশিল্প ও লঘু উদ্যোগীয় শিল্প, ১১১টি ছাত্রাবাস, ৩টি অনাথালয়, ৩টি বৃদ্ধাশ্রম, ২৩৬টি গ্রন্থাগার, ২০টি প্রধান পুস্তক প্রকাশনি কেন্দ্র, ৫টি বিকলাঙ্গ কেন্দ্র, ৩টি কৃষি বিদ্যালয়, বহু গোশালা, ৪টি গ্রাম্যবিকাশ শিক্ষাকেন্দ্র। এছাড়া রামকৃষ্ণ সংঘের অনেক কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মহামারিতে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা হয়। এর বাইরেও নানাবিধ দানের মাধ্যমে সমাজসেবামূলক কাজ করা হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা মেটাতে এবং তাদের উৎসাহিত করতে নানান পূজানুষ্ঠান ও সভার আয়োজন করা হয়। আবার সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সব ধর্মের আচার্যদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

বেলুড় মঠের দর্শনীয় স্থানসমূহ

ভগবান রামকৃষ্ণের মন্দির, পুরাতন মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দের কক্ষ, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বা রাজা-মহারাজের মন্দির, জগজ্জননী সারদা দেবীর মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দজীর মন্দির, সমাধিপীঠ, পুরোনো মঠ, রামকৃষ্ণ সংগ্রহমন্দির এবং মঠের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

সংঘগুরু পরম পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজজীর নিবাস স্থান, মঠ অফিস, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়, মা সারদা সেবাব্রত (অন্নপ্রসাদ দেওয়ার জায়গা), পল্লীমঙ্গল (গ্রামীণ হস্তশিল্প বিক্রয়কেন্দ্র),

পুস্তকালয়, বিবেকানন্দ দর্শন (প্রদর্শনী কেন্দ্র), প্রতীক্ষালয় (দুপুরে মঠ বন্ধ থাকে, সেই সময়ে দর্শনার্থীরা এখানে অপেক্ষা করতে পারেন)

বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

কলকাতার বেলুর মঠ থেকে স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশনন্দ ১৮৯৯ সালে ঢাকায় আসেন। বাংলাদেশে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই দুই শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে পুরান ঢাকার টিকাটুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। ১৯০৪ সাল থেকে এই মঠ ও মিশন বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রকাশনার কাজ শুরু করে। তারও বারো বছর পরে বেলুর মঠ একে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

ঢাকার জমিদার, ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক যোগেশ চন্দ্র দাসের দান করা সাত বিঘা জমিতে এ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর দান করা জমিতে মন্দির, সাধু নিবাস, হাসপাতাল, স্কুল, সংস্কৃতি ভবন তৈরি করা হয়।

১৯১৬ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী পরমানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ঐ বছরই পূর্ববঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল লর্ড কারমাইকেল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে নতুন মন্দিরের কাজ শেষ হয়।

বর্তমানে এই মঠটি বাংলাদেশস্থ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটি অধ্যাত্মচর্চা এবং সমাজসেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এরপর বাংলাদেশ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের আরও কিছু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়— বরিশাল (১৯০৪), নারায়ণগঞ্জ (১৯০৯), মানিকগঞ্জ (১৯১০), সিলেট (১৯১৬), ফরিদপুর (১৯২১), হবিগঞ্জ (১৯২১), ময়মনসিংহ (১৯২২), দিনাজপুর (১৯২৩) ও বাগেরহাট (১৯২৬)। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ছাড়াও এই কেন্দ্রগুলো চিকিৎসাসেবা, শিক্ষা, ত্রাণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজও পরিচালনা করে। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের চিকিৎসাকেন্দ্রটি ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর সহায়তায় কর্মকাণ্ড শুরু করে। বর্তমানে এটি মিশন পরিচালিত নানাবিধ সেবামূলক কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহযোগিতাসহ চিকিৎসাসেবা নিয়ে আর্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে একটি স্কুল ও একটি গণগ্রন্থাগার আছে। এখানে ঢাকার বাইরে থেকে আসা উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাসও আছে। গণগ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক আছে, তার সঙ্গে আছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অনেক বই ও পত্রপত্রিকা। প্রতিদিন নানা বয়সের বিপুল সংখ্যক মানুষ এখানে বই পড়তে আসে।

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মকাণ্ড সকল ধর্মের মানুষের জন্যই উন্মুক্ত। দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতীপূজাসহ ইসলাম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মের বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ধর্মীয় একত্বের অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বছরব্যাপী বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক খ্যাতিমান পণ্ডিতবর্গ। রামকৃষ্ণের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছর তাঁর জীবনদর্শন নিয়ে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশি-বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ

মানুষের উপস্থিতিতে এখানে রচিত হয় সহাবস্থানের এক মিলনক্ষেত্র। এটিই রামকৃষ্ণের জীবনদর্শন এবং রামকৃষ্ণ মিশনেরও আদর্শ।

- রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বার সকল ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত— এই বক্তব্যকে সমর্থন করে আমরা প্রত্যেকে 'আবাহন' ঘরে দুটি যুক্তি লিখি।

ছক ৩.২২: আবাহন ঘর

শ্রীঅঙ্গন

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান শ্রীঅঙ্গন। বাংলাদেশে মহানাম সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় আশ্রম এই শ্রী-অঙ্গন। মহানাম সম্প্রদায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী। এই সম্প্রদায়ের আধ্যাত্ম দেবতা প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর ফরিদপুরের গোয়ালচামটে শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা করেন। মহানাম সম্প্রদায়ের সদস্যরা জগদ্বন্ধু সুন্দরকে কৃষ্ণের অবতার বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রী-নিত্যানন্দের মিলিত রূপে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্রীঅঙ্গনের প্রতিষ্ঠাতা প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আবির্ভাব ২৮ এপ্রিল ১৮৭১ সালে। তিনি মা-নবলীলা সংবরণ করেন ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে; নিজের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম শ্রীঅঙ্গনে। তাঁর বাড়ি ফরিদপুর শহরের কাছের গ্রাম গোবিন্দপুরে। তবে তাঁর জন্ম হয়েছে বাবার কর্মস্থল মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়ায়।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর

তিনি শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৯ সালে। শ্রীঅঙ্গনের জন্য জমি দান করেন শ্রীরাম সুন্দর ও শ্রীরাম কুমার মুদি। দিনে দিনে শ্রীঅঙ্গন মহানাম প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। জগদ্বন্ধু সুন্দরের তিরোধানের পরবর্তী মাস থেকে শ্রীঅঙ্গনে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা অখণ্ড মহানাম সংকীর্তন চলছে।

ফরিদপুরের নতুন এবং পুরাতন বাসস্ট্যান্ডের মাঝামাঝি জায়গায়, ঢাকা-ফরিদপুর মহাসড়কের পাশেই শ্রী-

ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গন

অঙ্গনের অবস্থান। স্থানীয়দের কাছে আশ্রমটি আঙিনা নামেই বেশি পরিচিত। কোলাহলমুক্ত, খোলামেলা, ছায়াঘেরা এই অঙ্গনে এলে দর্শনার্থীর মন প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। প্রতিদিন এখানে প্রচুর পুণ্যার্থী আসেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে রাত্রিযাপন করেন। তাদের জন্য রয়েছে থাকার ব্যবস্থা। শ্রীঅঙ্গনেরে একাধিক ভক্তা-বাসে অসংখ্য ভক্ত থাকতে পারেন। এখানে প্রতিদিন প্রভুর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করা হয়। ভক্তরাও এখানে প্রসাদ ভোজন করতে পারে। এই ভোগ ভক্তদের কাছে অমৃতসম মনে হয়। অনেকে আবার বিভিন্ন মানত করে প্রভুর আশ্রম থেকে মালসা ভোগের অর্ডার করে বিভিন্ন শুভ কাজ, যেমন অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি পালন করে।

প্রতি বছর বৈশাখ মাসে শ্রী শ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের জন্মতিথিতে আশ্রমে বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়, মেলা বসে। নাটমন্দিরে অখণ্ড তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্তন হয়। সে সময়ে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশের ভক্তরা প্রভুর পুণ্যভূমি দর্শন করতে আসেন।

শ্রীঅঙ্গনের প্রবেশপথের ডান দিকে শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধু লাইব্রেরি আছে। সেখানে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের নানা গ্রন্থ, অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্যাপ্য ধর্মীয় গ্রন্থ, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, বেদ, আদি পঞ্জিকা ইত্যাদি পাওয়া যায়। এছাড়াও আছে বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি, ঘরে সাজিয়ে রাখার মতো ছোট মূর্তি, ঠাকুরের আসন, নিত্য প্রয়োজনীয়

পূজার সামগ্রী ইত্যাদি।

শ্রীঅঙ্গনে ঢুকতেই চোখে পড়বে একজন বৈষ্ণবের মূর্তি, যিনি তিলক হাতে আগতদের অভ্যর্থনা জানান।

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

এই অঙ্গনে প্রার্থনার জন্য রয়েছে বেশকিছু মন্দির। প্রভু জগদ্বন্ধু সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, সীতা নবমী তিথিতে ব্রাহ্মমুহূর্তে দীননাথ ন্যায়রত্ন তার স্ত্রী বামাদেবীসহ ভোরে গঙ্গায় স্নান করতে যান। শিশু জগদ্বন্ধু একটি পদ্মফুলের উপর শুয়ে ভাসতে ভাসতে সামনে এলে দীননাথ শিশুটিকে তুলে বামাদেবীর কোলে দেন। বামাদেবী জগদ্বন্ধুকে কোলে করে ঘরে গেলে জগদ্বন্ধু কেঁদে ওঠেন। তখন দীননাথ এবং বামাদেবী সকলকে জানালেন, 'আমাদের ছেলে হয়েছে'। শ্রীঅঙ্গনের একটি মন্দিরে এই কাহিনিটি প্রতিমার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আছে একটি নৌকা মন্দির। এই মন্দিরের ভেতরে একটি নৌকা রাখা আছে। এই নৌকায় চড়েই প্রভু জগদ্বন্ধু ভক্তদের নিয়ে পদ্মা নদীতে বেড়াতে যেতেন, সাধুসঙ্গ ও কীর্তন করতেন এবং রাতের শেষভাগে ফিরে আসতেন। এই নৌকা মন্দিরে সেই নৌকাটির ওপর কিছু তৈরি করা অবয়ব এমনভাবে রাখা আছে যা দেখে মনে হয় যে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর মাঝখানে বসে আছেন আর তাঁর চারপাশে অনুসারী ভক্তবৃন্দ বসে কীর্তন করছেন। অঙ্গনে আছে কাঠের তৈরি নান্দনিক রথ। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়ে হাজার হাজার ভক্ত এই রথটিকে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আরেকটি আশ্রমে টেনে নিয়ে যান আবার ফিরিয়ে আনেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ২১ এপ্রিল পাক-হানাদার বাহিনি ফরিদপুর শহরে আসে। তাদের সহযোগী ছিল একজন অবাঙালি ব্যক্তি। লোকটি হানাদার বাহিনিকে শ্রীঅঙ্গনে নিয়ে আসে। বরাবরের মতন সেখানে নামসংকীর্তন চলছিল। তারা গাইছিল 'জয় জগদ্বন্ধু।' বিহারী লোকটি মিলিটারিদের বোঝাল, আসলে এরা বলছে 'জয় বঙ্গবন্ধু'। তখনই মিলিটারিরা গুলি চালায়। নয়জন কীর্তনিয়ার মধ্যে কেবল একজন পালাতে পেরেছিল। বাকি আটজন মারা যান করেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর কেবল সেই সময়ে কয়েকদিনের জন্য শ্রীঅঙ্গনে কীর্তন বন্ধ হয়েছিল। আশ্রমে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। যে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে গুলি চালানো হয়েছিল তার নাম ছিল জামশেদ। শোনা যায়, দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন আগে ক্যাপ্টেন জামশেদ উন্মাদ হয়ে যায়। এরপর শ্রীঅঙ্গনে এসে নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করে। সেই আটজনের সমাধি রয়েছে শ্রীঅঙ্গনের চালতা গাছ তলায়। প্রত্যেক বছরের একুশে এপ্রিল তারিখে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে অসংখ্য মানুষ শ্রীঅঙ্গনে এসে এই আটজন শহিদের সমাধিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

এখানে আছে বিশাল রন্ধনশালা। আছে প্রসাদালয়; যেখানে প্রতিবছর উৎসবের সময়ে হাজার হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করে। আশ্রমের নিজস্ব গরুর খামারও আছে। যে পথে খামারে যেতে হয় সেই পথটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ধেনুপথ'। এখানে অফিস আছে, আশ্রম আছে। একটি ছাত্রাবাসও আছে। সেখানে বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য

নৃগোষ্ঠী, যেমন ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর ছাত্ররা রয়েছে।

শ্রীঅঙ্গনে আরও আছে তুলসী বেদী। আছে অনন্য সুন্দর নাটমন্দির। জগদ্বন্ধু সুন্দরের একটি অপরূপ বিগ্রহ আছে এখানে। এখানেই চব্বিশ ঘণ্টা নামকীর্তন করা হয়। আছে প্রভু জগদ্বন্ধুর সমাধি, গম্ভীরা সাধনগৃহ, আছে তাঁর বস্ত্র-সমাধি। এখানে আরও কিছু সমাধি মন্দির রয়েছে।

শ্রীঅঙ্গনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর নাম। তিনি মহানাম সম্প্রদায়ের একজন ধর্মীয় গুরু, লেখক, সংগঠক এবং দার্শনিক। তিনি প্রভু জগদ্বন্ধু সম্পর্কে জানার পর তাঁকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। আশি মাইল পথ পায়ে হেঁটে বরিশাল থেকে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে আসেন প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের দর্শন পেতে, সাধু হতে। কিন্তু বাবা-মায়ের অনুমতি না নিয়ে আসা ও এন্ট্রান্স পাস না করার জন্য সে যাত্রায় তাঁকে ফেরত যেতে হয়। সাধু হওয়ার তাগিদে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করে মায়ের অনুমতি নিয়ে শ্রীঅঙ্গনে আসেন। এখানে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য মহেন্দ্রজীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় যোগ দিতে যান। সেখানে তিনি বৈষ্ণব বেদান্তের ওপর শিক্ষাগ্রহণও করেন। আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপের নানা জায়গায় এ বিষেয়ে ভাষণ দেন। এর প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর পর তিনি দেশে ফেরেন। ফিরে আসেন শ্রীঅঙ্গনে। তিনি মানুষের অধ্যাত্মবোধ এবং মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে শান্তিময় সমাজ গঠনের জন্য ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ছুটেছেন, তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। দেশভাগের পর শ্রীঅঙ্গনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে তিনি দুর্গতদের সহায়তা করেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বিভিন্ন মঠ ও মন্দির সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

শ্রীঅঙ্গনে বিভিন্ন সময়ে এসেছেন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পল্লীকবি জসীম উদ্দীন অনেক মহান ব্যক্তিত্ব। সুমহান ইতিহাস এবং বর্তমানের উপযোগিতা আশ্রম হিসেবে শ্রীঅঙ্গনকে একটি অনন্য মহিমা দিয়েছে। তাই শতবছরেরও বেশি পুরোনো এই অঙ্গন এখন কেবল মহানাম সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছেই নয়, বরং সারাবিশ্বের হিন্দুধর্মবলম্বীদের কাছে একটি আকর্ষণীয় তীর্থক্ষেত্র।

- শ্রীঅঙ্গন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিয়ে এবং একটি ছবি এঁকে, নকশা করে 'শ্রীঅঙ্গন-কথা' পোস্টারটি সম্পূর্ণ করি।

ছক ৩.২৩: শ্রীঅঙ্গন-কথা

শ্রীঅঙ্গান-কথা

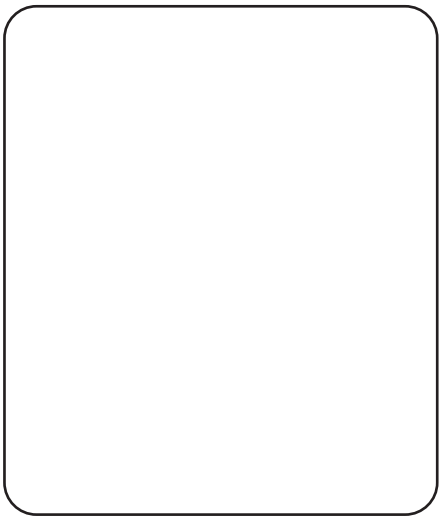

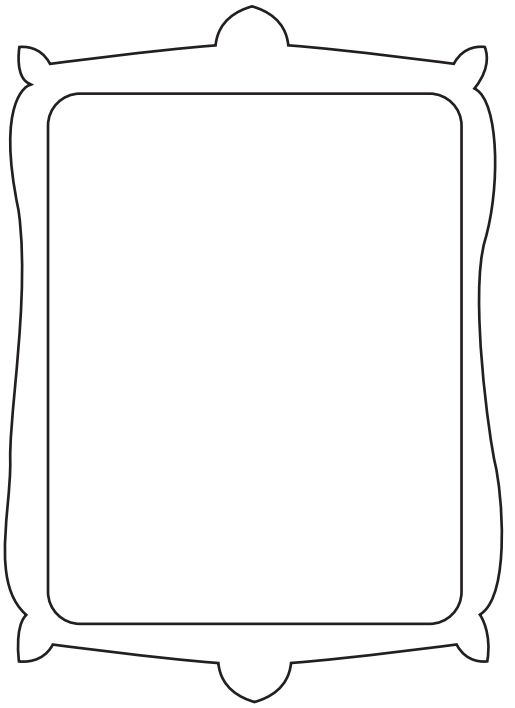

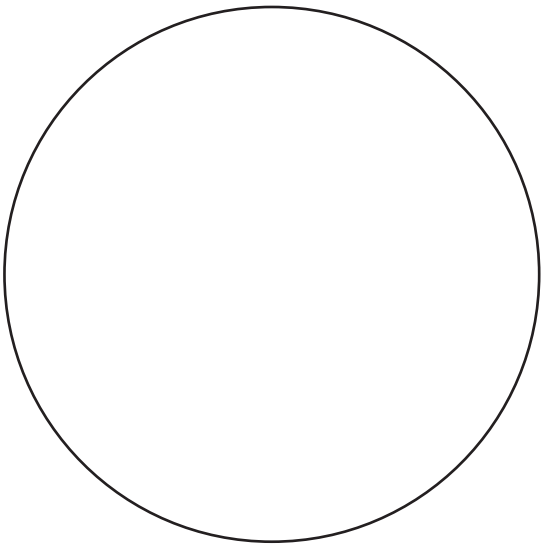

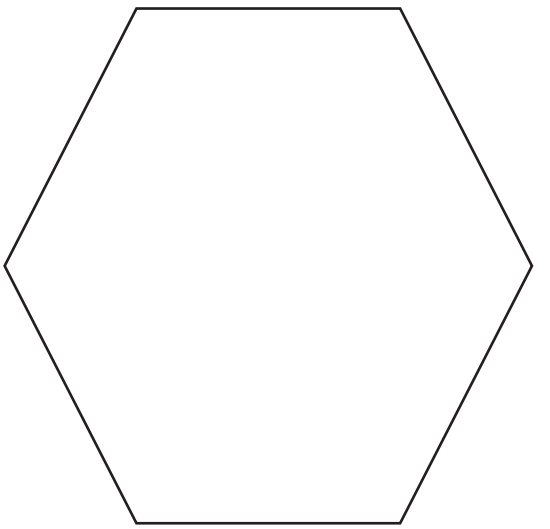

- আমরা প্রত্যেকে ‘আমার ভুবন’ ছকটি পূরণ করি।

আদর্শ মানবচরিত এবং ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জেনে আমি অনেক কিছু শিখেছি। অনেক কথা নতুন করে ভাবতে পারছি। এখান থেকে কিছু শিক্ষা আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনেও প্রয়োগ করতে পারি। যেমন:

১.

২.

- আদর্শ মানবচরিত এবং ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া মূল্যবোধগুলো আমরা নিজেদের সামাজিক জীবনে এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে কাজে লাগাতে পারি। এ সম্পর্কে 'কল্যাণ-কর্ম ১' ছকটি নিজের মতন করে পূরণ করি।

ছক ৩.২৪: কল্যাণ-কর্ম ১

সামাজিক জীবনের জন্য মূল্যবোধ	মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণের জন্য মূল্যবোধ
ছোট-বড় ভেদ না করে সবাইকে সমান চোখে দেখা।	অভুক্ত মানুষকে খাবার দেওয়া।

- চলো, এবারে আমরা যার যার 'প্রতিফলন ডায়েরি' লিখি।

ছক ৩.২৫: প্রতিফলন ডায়েরি

আদর্শ মানবচরিত এবং ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া মূল্যবোধ থেকে উদ্দীপ্ত হয়ে আমরা এই কাজটি করেছি:	
কাজটি করার পরে আমার অনুভূতি:	এ ধরনের কাজ সম্পর্কে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

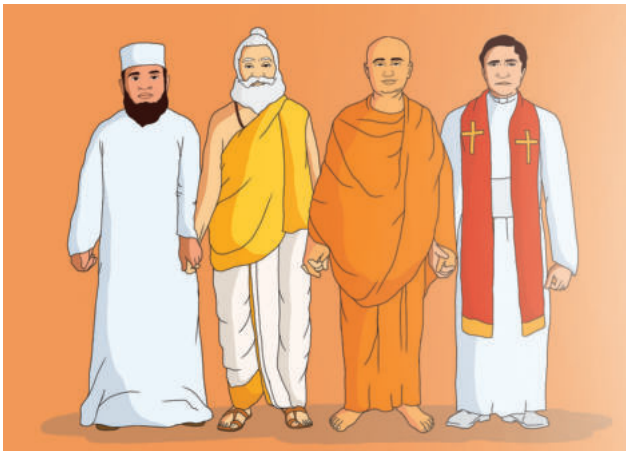

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরমতসহিষ্ণুতা

- আমাদের এই পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। আমাদের চারপাশের নানান উপাদানে সেই বৈচিত্র্যকে খুঁজে পাই। যদি প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখি, তাহলে দেখব কত বিচিত্র উপাদানেই না সে নিজেকে সাজিয়েছে— নদী, পাহাড়, সূর্য, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ! আবার একই নামের জিনিসেরও আছে নানা রকমের প্রকরণ। যেমন গাছের কথাই যদি ধরি, শিরিষ, জারুল, কুমড়ো, পদ্ম... এ রকম কত ভিন্ন ভিন্ন নাম। তাদের আকারে গড়নে ধরনে বর্ণে-পাতায়-পুষ্পে কত ভিন্নতা!

- আমরা প্রত্যেকে পাঁচ রকমের পাতা সংগ্রহ করে, সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে 'বৈচিত্র্যময় পৃথিবী' ছকটি পূরণ করি।

ছক ৩.২৬: বৈচিত্র্যময় পৃথিবী

পাতার নাম	আকার/ গড়ন	আকৃতি	রং (গাঢ়/ হালকা)

বিচিত্রতা আছে মানুষে মানুষে। মানুষের গড়ন, রুচি, ভাষা, সংস্কৃতি, আচরণ, বিশ্বাস, ধর্ম— সবকিছুতেই আছে কত না রকমফের! তাই জয়শ্রীর যখন আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করে অনির্বাণের তখন ইচ্ছে করে তেঁতুলের

শরবত খেতে। নীলাদ্রি যখন পর্বতে যাবে বলে ঠিক করে মেঘদীপা তখন সমুদ্রেই যাব বলে গোঁ ধরে। এসব ক্ষেত্রে যদি দুজনের ইচ্ছেই আলাদা করে পূরণ করবার সুযোগ থাকে তাহলে তেমন সংকটের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যদি এমন হয় যে, একজনের ইচ্ছেই পূরণ করা যাবে, তখন কাউকে না কাউকে ছাড় দিতে হয়। নইলে সংঘাত হয়; তাতে আপাতদৃষ্টিতে একজনের লাভ হয়েছে বলে মনে হলেও, ক্ষতি কিন্তু দুজনেরই কম-বেশি হয়। আবার জয়শ্রী যদি অনির্বাণকে জোর করতে চায় যে, আইসক্রিমই খেতে হবে অথবা নীলাদ্রি মেঘদীপাকে পর্বতে যেতে বাধ্য করে তাহলে চরম অশান্তি হবে। অন্যরকমভাবেও সমস্যার সমাধান হতে পারে— আজ আইসক্রিম কাল তেঁতুলের শরবত, আজ সমুদ্র কাল পাহাড়।

আমরা পাতার মধ্যে যে বৈচিত্র্য পেয়েছি তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করব। পোস্টার প্রদর্শনী, মাল্টিমিডিয়া, বক্তৃতা, পাতা প্রদর্শনী ইত্যাদি কোন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করলে সবচেয়ে ভালো হয় তা নিয়ে সকলে মিলে দুই-রকমভাবে আলোচনা করব। প্রথমে সবাই যে যার মতন করে মতামত দেবো এবং নিজের মতে অনড় থাকব। তারপরে প্রত্যেকে অন্যের মত শুনে এবং গুরুত্ব দিয়ে সবার মত মিলিয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করব।

- আমরা জেনেছি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অপরের মতামতকে গুরুত্ব না দিলে কী হয় এবং অন্যের মতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে কেমন হয়। এবারে এই বিষয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে দলে/ জোড়ায় আলোচনা করি। তারপর প্রত্যেকের নিজের যা মনে হয় সে অনুযায়ী 'মতবৈচিত্র্য' ছক পূরণ করি।

ছক ৩.২৭: মতবৈচিত্র্য

নিজের মতকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইলে	নিজের মতকে জোর করে চাপিয়ে দিতে না চাইলে
১. ঝগড়া-বিবাদ অশান্তি হয়।	১. শান্তি বজায় থাকে।
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

যদি এই পৃথিবীতে কেবল একই রকমের প্রাণী থাকত, সবকিছুর রং এক হতো, সবাই একই পেশায় কাজ করত তাহলে ব্যাপারটা কেমন হতো ভেবে দেখি। প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য না থাকলে সৃষ্টিজগৎ কি টিকে থাকতে পারত? তেমনি মানুষে মানুষে যে মতভিন্নতা সেটিও জরুরি। সবার পছন্দ, সবার মতামত যদি একরকম হতো তাহলে কেমন হতো আসলে? পৃথিবীর উপাদান, মানুষের মতামতের মতন প্রকৃতির নিয়মেও বৈচিত্র্য আছে। আবার এই সকল বৈচিত্র্যর মাঝে আছে ঐক্য। বৈচিত্র্যকে যেমন স্বীকার করতে হয়, তেমনি ঐক্যের নিয়মকেও মানতে হয়। এবারে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে ঐক্যবদ্ধতার বিষয়ে আমাদের হিন্দুধর্ম কী বলছে জেনে নিই।

সকলে সহমত হলেই শান্তি আসে না, শান্তি তখন আসে, যখন ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে আমরা পাশাপাশি চলতে পারি।

শিবমহিম্নস্তোত্রে বলা হয়েছে-

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাম্।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।

অর্থাৎ বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই একই সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়। তেমনি নিজের রুচির বৈচিত্র্যের কারণে সোজা-বাঁকা নানা পথে যারা চলছে, হে ঈশ্বর, তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

বৈচিত্র্যময়তা যেমন পৃথিবীকে সুন্দর করেছে, তেমনি সংঘাতেরও সুযোগ তৈরি করেছে। এই সংঘাত এড়াতে প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণুতার। ব্যক্তি জীবন থেকে বৃহত্তর সমাজ জীবনে সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য পরমতসহিষ্ণু হওয়া খুবই জরুরি। তাহলে জয়শ্রী, অনির্বাণ, নীলাদ্রি, মেঘদীপা কিংবা রফিক, সুলতানা, ব্রান্ডেন, জেনোলিয়া, আনুচিং, রাহুল সকলের জীবনই আনন্দময় হতে পারে।

পরমতসহিষ্ণুতা মানে অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। কেবল নিজে মত দেওয়া নয়, অপরকেও মতামত দেওয়ার সুযোগ দেওয়া। নিজের মতের সঙ্গে না মিললেও অন্যের মতকে গুরুত্ব দেওয়া। সকলের মত প্রকাশের অধিকারকে সাদরে গ্রহণ করা। পরমতসহিষ্ণুতা শিষ্টাচারের অঙ্গ, একই সঙ্গে ধর্মেরও অঙ্গ। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম সত্য, সুন্দর, কল্যাণের কথা বলে। প্রতিটি ধর্মই পরমতসহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা দেয়। ঋগ্বেদে পরমতসহিষ্ণুতা নিয়ে নিচের কথাগুলো বলা আছে।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।

সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েবঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়াণি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

(ঋগ্বেদ: ১০.১৯১.২-৪)

সরলার্থ: হে মানব, তোমরা একসঙ্গে চলো, একসঙ্গে মিলে আলোচনা করো, তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হোক। তোমাদের পূর্বকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেরকম কর্তব্য পালন করেছে, তোমরাও তেমনটাই করো। তোমাদের সকলের মিলনের মন্ত্র এক হোক, মিলন ভূমি এক হোক, মনসহ চিত্ত এক হোক। তোমাদের সকলকে আমি একই সাম্যের মন্ত্র এবং খাদ্য ও পানীয় দিয়েছি। তোমাদের সকলের হৃদয়ের আকুতি এক হোক, হৃদয় এক হোক। মন এক হোক, সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।

মানবজাতির মধ্যে ভিন্নমত, বৈচিত্র্য থাকলেও পরমতসহিষ্ণুতার চর্চার মাধ্যমে বেদ-এ মানুষের প্রতি ঈশ্বরের এই ঐক্যবদ্ধতার আহ্বানকে আমরা বাস্তব-রূপ দিতে পারি।

শিকাগো ধর্মসম্মেলনের বক্তারা শ্রোতাদের প্রথাগতভাবে ‘ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ’ সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সবাইকে ‘ভ্রাতা ও ভগিনী’ বলে সম্বোধন করেন। অজানা-অচেনা লোকদের এভাবে ভাই-বোন বলে আপন করে নেয়ার মানসিকতা দেখে শ্রোতারা মুগ্ধ হন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক-ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।’

সেখানে অনেকেই কেবল নিজ-নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বললেন, 'যে ধর্ম অন্যকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতার ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি।'

হিন্দুধর্মের অনুসারী হিসেবে, দৈনন্দিন জীবনে পরমতসহিষ্ণুতার নীতিগুলো প্রয়োগ করা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রতিবেশী, সহপাঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চর্চা আমার চেয়ে আলাদা হলেও তাকে সম্মান করা উচিত। বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের মনকে উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। এভাবে আমরা বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

শিকাগো ধর্মসম্মেলন, ১৮৯৩

হিন্দুদর্শন অনুযায়ী, আমাদের শরীরটা আসল 'আমি' নয়, আসল 'আমি' হলো আমাদের চৈতন্য বা জীবাত্মা; যা পরমাত্মারই অংশ। চৈতন্য দেহটাকে আশ্রয় করে আছে কেবল। তাই একের থেকে অপরের বাইরের আবরণে, আচরণে তফাৎ হয় কিন্তু সকলের ভেতরে একই সত্তা। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী একবার ছেলে মানুষ কার্তিক অকারণে একটা বেড়ালকে বল্লমের খোঁচা দিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে দেখলেন মা ভগবতীর মুখে আঘাতের চিহ্ন। কার্তিক এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে মা জবাব দিলেন, এ তোমারই বল্লমের আঘাত। কার্তিক বললেন, আমি একটা বেড়ালকে আঘাত করেছি বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ! ভগবতী জবাব দিলেন, আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছি। সমস্ত প্রাণীই আমার সন্তান। তুমি যাকে আঘাত করো, সে আঘাত আমাতেই লাগে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'মানুষ জাতি' কবিতায় বলেছেন—

'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।'

বিশ্বের সকল মানুষের গায়ের রং, পোশাক, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি নানান কিছুতে রকমফের আছে, ভিন্নতা আছে দৃশ্যমান 'আমি'তে। কিন্তু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে আসলে কোনো আত্মিক দূরত্ব নেই। সকলের আত্মা সেই এক পরমাত্মার অংশ। কালের নিয়মে সকলের আত্মাই এক পরমাত্মায় মিশে যাবে। আমাদের ইহজাগতিক জাতিভেদ, ধর্মভেদ, মতভেদ— সমস্তই অসহিষ্ণুতার ফল। পরমতসহিষ্ণুতাই পারে এসব ভেদচিহ্ন মুছে দিতে। যে-কোনো ধর্মপ্রাণ, মানবতাবাদী মানুষের প্রধানতম গুণ হলো পরমতসহিষ্ণুতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হিন্দুধর্মীয় নানা পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে গল্প বলার মাধ্যমে ভক্তদের উপদেশ দিতেন। পরমতসহিষ্ণুতার বিষয়ে তিনি এই গল্পটি বলতেন—

ঘণ্টাকর্ণ

এক লোক দিনরাত শিবের আরাধনা করত। অপরদিকে অন্যান্য দেবদেবীর প্রতি ভক্তি দেখানো তো দূরের কথা, লোকটি তাঁদের রীতিমতো ঘৃণা করত। একদিন শিব তাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'সব দেবতাই তো এক। একজনকে ঘৃণা করলে সকলকেই ঘৃণা করা হয়। তুমি যতদিন না অন্যান্য দেবতাদের ভক্তি করবে ততদিন আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হব না।' কিন্তু তাতে ফল হলো উল্টো; লোকটি প্রকাশ্যে শিব বাদে বাকি সকল দেব-দেবীর নিন্দা করতে লাগল। তাদের নাম শুনলেও ক্ষেপে উঠতে লাগল। দিনে দিনে এই কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। তাকে ক্ষেপানোর জন্য ছেলেদের দল কানের কাছে 'শ্রীবিষ্ণু' বলে চেঁচাতে শুরু করল। লোকটি তখন অন্য কোনো দেব-দেবীর নাম কানে শুনতেও নারাজ। তাই সে দুই কানে দুইটা ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিল। ছেলের দল যখনই শ্রীবিষ্ণুর নাম করে তখনই সে প্রবলভাবে মাথাটা নাড়াতে থাকে। তখন ঘণ্টার আওয়াজে তার কানে আর বিষ্ণুর নাম যায় না। গোঁড়ামির জন্য সে সকলের এমন ঘৃণার পাত্র হলো যে, আজও ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে লোকে ঘণ্টাকর্ণের মূর্তি গড়ে ভেঙে ফেলে।

এই গল্পটির উপদেশ হলো এই যে, ধর্মের গোঁড়ামি মহাপাপ। সকল ধর্মেই সত্য আছে— যে তা না দেখে সে কখনই ধার্মিক নয়।

- আমরা 'ঐকতান' ছকের বক্তব্যগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে, ভালোভাবে বুঝে পাশের উপযুক্ত ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে যে যার মতামত প্রকাশ করি।

ছক ৩.২৮: ঐকতান

বক্তব্য	সহমত	আংশিক সহমত	সহমত নই
মানুষে মানুষে মতের ভিন্নতা না থাকলে পৃথিবী আনন্দময় হতো।			
পরমতসহিষ্ণুতা যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়াতে সাহায্য করে তেমনি অন্যায়কে সহ্য করার মতন পরিবেশও তৈরি করে।			
বেশির ভাগ মানুষ ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন।			
পরস্পরের ভাবগ্রহণের জন্য পরস্পরের সম্পর্কে জানা জরুরি।			

বক্তব্য	সহমত	আংশিক সহমত	সহমত নই
হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা বা অন্য কোনো ধর্মমত মেনে চলার উদ্দেশ্য এবং ফলাফল একই।			
সকল মানুষের মনসহ চিত্ত এক হতে হলে পৃথিবীতে ধর্মও একটি হওয়া প্রয়োজন।			
সকল ধর্মমত একই পথে চলে।			
পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই সত্য; প্রতিটি ধর্মই গুরুত্বপূর্ণ।			
যে ব্যক্তির নিজস্ব মতামত প্রকাশের যোগ্যতা নেই তার কাছে পরমতসহিষ্ণুতার গুণ আশা করা যায় না।			

মনুসংহিতায়ও সহিষ্ণু হতে বলা হয়েছে,

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥ (৬/৯২)

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, আত্ম-সংযম, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং ক্রোধহীনতা— ধর্মের এই দশটি লক্ষণ।

'বিবিধের মাঝে মিলন মহান'— এটাই হিন্দুধর্মের মূল চেতনা। হিন্দুধর্ম যেমন অন্য ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা দেয় তেমনি এই একই ধর্মের ভেতরে বহু মত ও পথের সহাবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়; এখানে অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, একেশ্বরবাদী, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন– 'যত মত তত পথ'। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসহ প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই জীবের প্রতি ভালোবাসার কথা, মানবকল্যাণের কথা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাম্যের বাণী প্রচারিত হয়েছে। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলেছেন– 'ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য এসবই জগতের ব্যবহারিক সত্য, মনের সৃষ্টি। আমি যে জগতের লোক সেখানে নেই কোনো ভেদ, সেখানে সবই সমান-সবই সুন্দর।'

- কুয়োর ব্যাঙের গল্পটা পড়ি।

কূপমণ্ডূক

একটা কুয়ার মধ্যে থাকত এক ব্যাঙ। সেই কুয়াতেই সে জন্মেছে, সেখানেই বেড়ে উঠেছে। কুয়ার জলের মধ্যে জন্মানো পোকামাকড় খেয়েই জীবন কাটিয়েছে। কোনোদিন কুয়ার বাইরে যাবার কোনো প্রয়োজনই ব্যাঙটি বোধ করেনি। সেই কুয়ায়ও কেউ কোনোদিন আসেনি। তাই কুয়ার বাইরের পৃথিবীর খবর আমাদের গল্পের ব্যাঙটির একেবারেই অজানা। একদিন হঠাৎ কোথা থেকে একটা ব্যাঙ এসে সেই কুয়ায় উপস্থিত হলো—

কুয়ার ব্যাঙ: কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

নতুন ব্যাঙ: সমুদ্র থেকে আসছি।

কুয়ার ব্যাঙ: সমুদ্র? সে কত বড়?

নতুন ব্যাঙ: সমুদ্র অনেক বড়।

কুয়ার ব্যাঙ: বটে! তা সে কি আমার এই কুয়ার মতো বড়?

(এই বলে কুয়ার ব্যাঙটি কূপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে লাফ দিল।)

নতুন ব্যাঙ: ওহে ভাই, তুমি এই ক্ষুদ্র কূপের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করবে কী করে?

(এই কথা শুনে কূপমণ্ডূক আরও একবার লাফ দিল)

কুয়ার ব্যাঙ: তোমার সমুদ্র কি এত বড়?

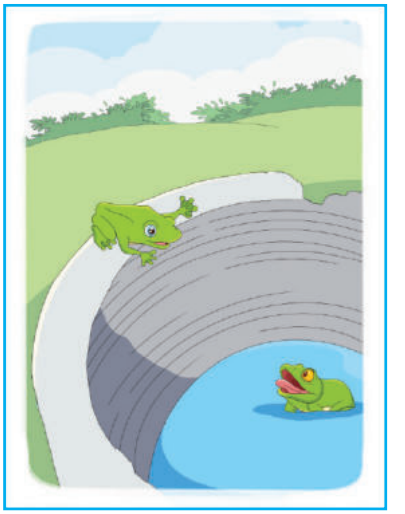

কুয়োর ব্যাঙ ও সমুদ্রের ব্যাঙ

নতুন ব্যাঙ: সমুদ্রের সঙ্গে কুয়ার তুলনা করে তুমি অত্যন্ত মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছ!

কুয়ার ব্যাঙ: আমার কুয়ার মতো বড় পৃথিবীতে আর কিছুই হতে পারে না।

তুমি নিশ্চয়ই মিথ্যা বলছ! তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত!

- আমরা প্রত্যেকে 'কুয়ার ব্যাঙ' গল্পটা নিয়ে ভাবি ও লিখি।

ছক ৩.২৯: কূপমণ্ডূকতা

'কূপমণ্ডূক' কথার মানে কী?
এই গল্পটি পড়ে তুমি কী বুঝেছ?

কুয়ার ব্যাঙকে কি তোমার পরমতসহিষ্ণু বলে মনে হচ্ছে? কেন? বুঝিয়ে লেখো।

কারোর সঙ্গে আমার মত মিলছে না বলে ধরে নেবো না যে তার মতটা ভ্রান্ত। একজন মানুষ আমার পথে হাঁটছে না বলেই ধরে নেবো না যে, সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন, যারা অন্য দেবতায় ভক্তিমান হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের পূজা করে, তারা ঈশ্বরেরই পূজা করে (৯/২৩)। সুতরাং সকল ধর্মের মানুষই তাদের নিজ নিজ মত ও পথ অনুসরণ করে একই ঈশ্বরের উপাসনা করে।

সব পথেরই গন্তব্য এক

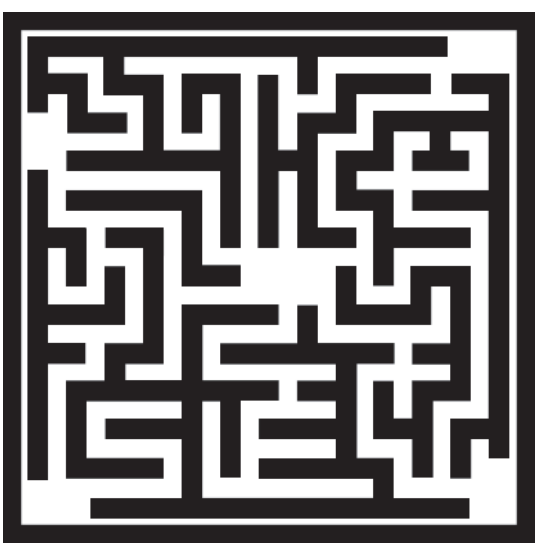

মেইজ গেইম

বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অনেকেই নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে এসেছেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা তাদের ভাবনার প্রসারে নানাবিধ বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকগণও অনেক বাধা-বিপত্তির মুখে পড়েছেন। কিন্তু আমাদের এই অঞ্চল এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এখানে সুপ্রাচীনকাল থেকেই পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা হয়েছে। তাই এখানে ধর্মপ্রচারকদের অভিজ্ঞতাও ব্যতিক্রম। এই অঞ্চলে হিন্দুধর্ম যেমন বিকশিত হয়েছে। তেমনি অন্যান্য ধর্মমতের বিকাশও ঘটেছে সাবলীলভাবে।

পৃথিবীর সকল প্রাণীর মঙ্গলকামনার উদার প্রার্থনা এখানকার মানুষ সাত হাজার বছর আগে থেকে করছে।

সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রচলিত শ্লোকে বলা হয়েছে—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্‌ভবেৎ।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

যার অর্থ সবাই সুখী হোক, সকলে আরোগ্য লাভ করুক, সকলে কল্যাণ লাভ করুক, যেন কেউ দুঃখ ভোগ না করে। জগতের সকল প্রাণী শান্তি লাভ করুক।

ধর্মীয় সহনশীলতা

হিন্দুধর্ম ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ একটি ধর্ম। এই ধর্মে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানান রকমের বিশ্বাস ও অনুশীলনের সমন্বয় ঘটেছে। হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় চর্চাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সাদরে গ্রহণ করে। তাই একজন মানুষ হিসেবে যেমন তেমনি হিন্দুধর্মাবলম্বী হিসেবেও আমরা পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করব।

- আমরা পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি। এবারে আমরা প্রত্যেকে নিজের জীবনে কীভাবে পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করব তা একটি গল্প/কবিতা/অনুচ্ছেদ/নাটিকা লিখে প্রকাশ করি।

- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে সকলের লেখাগুলো সংশোধন করে আলাদা কাগজে তুলে একটি ম্যাগাজিন তৈরি করি।
- আমরা হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে জেনেছি। এবারে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বন্ধু/ শিক্ষক/ পরিচিতজনদের কাছ থেকে প্রত্যেকে জেনে নিই তাদের ধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা নিয়ে কী বলা হয়েছে।
- শ্রেণির বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সবাই মিলে একটি মেলার আয়োজন করি। প্রত্যেক ধর্মের শিক্ষার্থীরা সেখানে তার ধর্মের পরমতসহিষ্ণুতার কথাগুলো তুলে ধরতে পারবে। আমরাও হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা নিয়ে অনেকগুলো পোস্টার তৈরি করে মেলায় প্রদর্শন করি।
- ম্যাগাজিন তৈরি ও মেলার অভিজ্ঞতার আলোকে টিক/ ক্রস চিহ্ন ও মন্তব্য দিয়ে প্রত্যেকে 'ধর্মীয় সহিষ্ণুতা' ছকটি পূরণ করি।

ক্রম	বক্তব্য	সম্পূর্ণ সহমত	সহমত নই	মন্তব্য
১.	সকল ধর্মেই ভিন্ন ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে।			
২.	অন্যের ধর্ম বিশ্বাস আমার সঙ্গে না মিললেও আমি তার বিশ্বাসকে সম্মান করি।			
৩.	পরমতসহিষ্ণুতার গুণ না থাকলেও একজন মানুষ ধার্মিক হতে পারে।			
৪.	ধর্মপ্রাণ মানুষ ভিন্ন ধর্মের মানুষকেও তার ধর্ম পালন করার সুযোগ দেয়।			
৫.	ভিন্ন ধর্মের মতকে সত্য বলে মানলে ধর্মচ্যুত হতে হয়।			

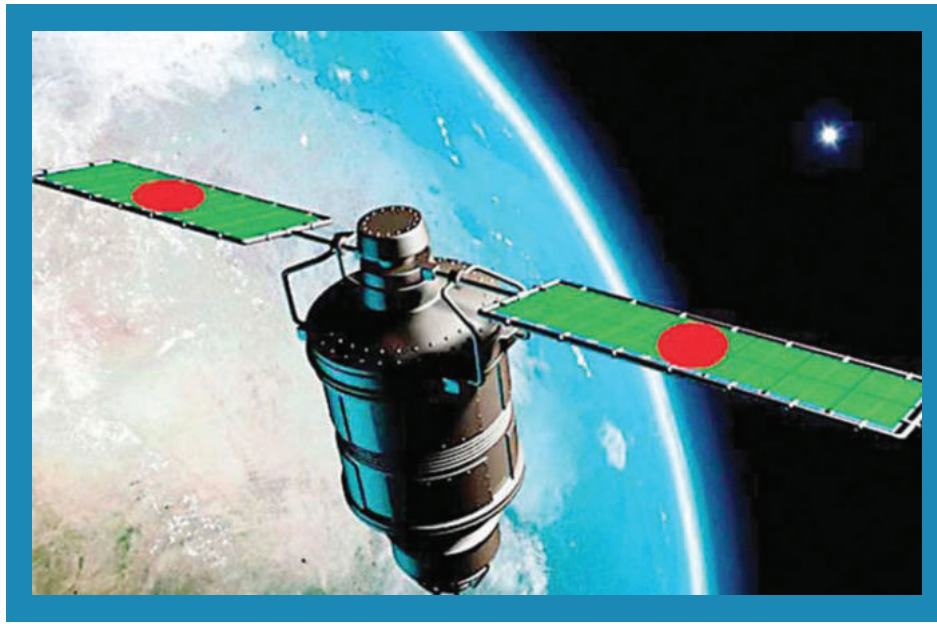

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ : বাংলাদেশের মালিকানাধীন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির (Geostationary) যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ। এর মধ্য দিয়ে ৫৭ তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। এটি ১১ই মে ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ছিল ফ্যালকন ৯ ব্লক-৫ রকেটের প্রথম পেলোড উৎক্ষেপণ।

এটি ফ্রান্সের থেলিস অ্যালেনিয়া স্পেস কর্তৃক নকশা ও তৈরি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, ১৬০০ মেগাহার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪০টি কে-ইউ এবং সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার বহন করছে এবং এর আয়ু ১৫ বছর। এর নির্মাণ ব্যয় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইথ ও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ইন্টারনেট বঞ্চিত অঞ্চল যেমন- পার্বত্য ও হাওড় এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট ও ব্যাংকিং সেবা, টেলিমেডিসিন ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রসারেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলো তাদের সম্প্রচার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে এর উপর নির্ভর করছে। ফলে দেশের টাকা দেশেই থাকছে। বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়লে এর মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় যোগাযোগ চালু রাখা সম্ভব। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ মহাকাশে উৎক্ষেপণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন, সেই স্বপ্ন মহীরূহে পরিণত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

স্যাটেলাইটের বাইরের অংশে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার রঙের নকশার উপর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু-১, বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোগ্রামও সেখানে রয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করো

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জীবসেবা পরম ধর্ম

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য